অশরীরী আত্মা
রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

অশরীরী আত্মা-৬২

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

❑

একটা ছায়ামূর্তির আকর্ষণে বনহুর যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে চলেছে। ছায়ামূর্তি যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। বনহুর একমনে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে সে নিজেই জানে না।

একটা উচ্চ প্রাচীরের পাশে এসে ছায়ামূর্তি থামলো।

বনহুরও গাড়ি রেখে নেমে পড়লো।

ছায়ামূর্তি প্রাচীরের দিকে এগুতে শুরু করলো। বনহুর ওকে অনুসরণ করলো। ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে এগুচ্ছে। জ্যোছনার আলোতে ছায়ামূর্তির শুভ্র বসন অদ্ভুত লাগছে।

বনহুর তন্দ্রাচ্ছন্নের মত ছায়ামূর্তির পাশে এসে দাঁড়ালো। বললো—কে...... কে তুমি?

ছায়ামূর্তি নীরব।

বনহুর জ্যোছনার আলোতে ভালো করে তাকালো। ছায়ামূর্তির মুখখানা সে লক্ষ্য করলো কিন্তু ছায়ামূর্তির মুখখানা বিপরীত দিকে থাকায় তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না।

ছায়ামূর্তি এগুচ্ছে।

বনহুর থামলে ছায়ামূর্তিও থেমে পড়ে।

বনহুর আবার বললো—আমার প্রশ্নের জবাব দাও। বলো কে তুমি?

ছায়ামূর্তি নীরবে এগিয়ে যাচ্ছে, কোনো কথা বলছে না।

বনহুর তাকে অনুসরণ করে চলেছে।

প্রাচীরের পাশ কেটে এগুচ্ছে ছায়ামূর্তি।

নিঝুম রাত।

সমস্ত লাহোর নগরী ঘুমে অচেতন।

আকাশে অসংখ্য তারার প্রদীপ জ্বলছে।

বনহুরের মনে এক অভূতপূর্ব অনুভূতি। সে জানে না কে ঐ ছায়ামূর্তি। শুভ্রবসনা। এলায়িত কেশরাশি কাঁধের উপর ছড়িয়ে আছে। মৃদু মৃদু বাতাস বইছে। ছায়ামূর্তির শুভ্রবসন বাতাসে উড়ছে। বনহুর বিস্ময় বিমুগ্ধ, মন্ত্রমুগ্ধের মূর্তির মত এগুচ্ছে সে।

হঠাৎ পিছনে শোনা যায় একটা কণ্ঠস্বর—সর্দার!

সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্তি মিশে যায়, অদৃশ্য হয়ে যায় যেন সে বাতাসের মধ্যে।

বনহুর স্থবিরের মত দাঁড়িয়ে পড়ে।

পাশে এসে দাঁড়ায় রহমান—সর্দার, এ আপনি কোথায় এসেছেন?

বনহুর জ্যোছনার আলোতে ফিরে তাকায় রহমানের মুখের দিকে, ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে—সব তুমি নষ্ট করে দিলে রহমান।

এ আপনি কি বলছেন সর্দার? আমি নষ্ট করলাম?

দেখলে না তোমার আগমনে সে অদৃশ্য হয়ে গেলো?

কে! কার কথা বলছেন সর্দার?

সেই শুভ্রবসনা ছায়ামূর্তি।

কই, কোথায়, আমি তো কাউকে দেখতে পাইনি সর্দার!

তুমি কি অন্ধ হয়ে গেছো! দেখোনি আমার সম্মুখে কে একজন এগিয়ে যাচ্ছিলো।

না সর্দার, আমি কাউকে দেখিনি। সর্দার, ফিরে চলুন। ফিরে চলুন সর্দার, ওটা প্রেত আত্মা........

প্রেত আত্মা.......হাঃ হাঃ হাঃ প্রেত আত্মা। কার প্রেত আত্মা, কিসের প্রেত আত্মা! বলো রহমান কার প্রেত আত্মা!

জানি না।

তবে যে তুমি বলছো প্রেত আত্মা। প্রেত আত্মা আমি মানি না।

সর্দার, আপনি এখন সুস্থ নন.....

আবার বনহুর অট্টহাসিতে ভেংগে পড়ে—হাঃ হাঃ হাঃ।

সর্দার চলুন, চলুন আপনি।

না, তুমি যাও।

এ কি বলছেন?

হাঁ, আমি জানি কে সে। আর কেনইবা সে আমাকে এখানে এনেছে।

সব স্বপ্ন সর্দার।

না না, স্বপ্ন নয়। তুমি চলে যাও রহমান।

না, আমি আপনাকে একা এখানে রেখে যাবো না। যেতে পারি না সর্দার।

যাবে না?

না।

তাহলে সে আর আসবে না।

কে আসবে না সর্দার?

সেই শুভ্রবসনা।

সর্দার, কোনো শক্রু হতে পারে। আপনাকে বিপদে ফেলার জন্য।.........

না না, নিশ্চয়ই কোনো মহৎ উদ্দেশ্য আছে ঐ শুভ্রবসনার, না হলে সে কখনই আমাকে এমনভাবে এখানে নিয়ে আসতো না। রহমান, তুমি চলে যাও, আমি দেখতে চাই কে সে, আর কেনই বা আমাকে এখানে এনেছে।

আপনি একা, এ অবস্থায়....

আবার বনহুর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে, তারপর হাসি থামিয়ে বলে— আমি কচি ছেলে নই। যাও রহমান, আমি এর শেষ দেখতে চাই......

বেশ, আমি যাচ্ছি।

হাঁ যাও।

রহমান মাথা নীচু করে বিষন্ন মনে চলে যায়। যাবার সময় একবার তাকায় সে তার সর্দারের মুখের দিকে।

জ্যোছনার আলোতে বনহুরের চোখ দুটো যেন স্বপ্নময় মনে হচ্ছে। প্রশস্ত ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। চুলগুলো এলোমেলো। তার ঠোঁট দু'খানাকে বড় শুকনো মনে হলো রহমানের কাছে। নীরবে চলে গেলো সে।

বনহুর তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে রহমানের চলে যাওয়া পথের দিকে, ভাবছে, সত্যি রহমানকে সে তাড়িয়ে দিলো। ওকে এভাবে চলে যেতে বলা তার কি উচিত হয়েছে? সত্যিই যদি এটা কোনো ভূতুড়ে ব্যাপার হয়? আপন মনেই হাসলো বনহুর। মানবদেহী নর-খাদককেই সে ভয় করেনি, এটাতো একটা ভূতুড়ে কাণ্ড বলেই মনে হচ্ছে তার। রহমান বলেছে প্রেত আত্মা, হয়তো কোন অশরীরীই হবে।

হঠাৎ বনহুরের কানে একটা সুন্দর সুমিষ্ট কণ্ঠ ভেসে এলো, যেন বহুদূর থেকে কেউ তাকে ডাকছে..... এসো.... অমন দাঁড়িয়ে রইলে কেন.....

বনহুর ফিরে তাকাতেই আবার সেই শুভ্রবসনা নারীমূর্তি দেখতে পায়। তার কাছ থেকে ছায়ামূর্তিটি বেশি দূর নয়, তবু তার কণ্ঠস্বর যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে বলে মনে হলো। এ স্বর যেন তার পরিচিত। কিন্তু কোথায় শুনেছে, কবে শুনেছে, খেয়াল করতে পারে না বনহুর।

নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে বনহুর।

শুভ্রবসনা খিল খিল করে হেসে উঠে, আবার সেই কণ্ঠ.....তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পারছো না? ওগো বন্ধু...... এসো..... এসো, আমি কে, জানো?

বনহুর অস্ফুট কণ্ঠে বললো—না।

.....তুমি এত মনভোলা, এরই মধ্যে আমাকে ভুলে গেছো?

বনহুর শুনতে পাচ্ছে, মনে হচ্ছে কথাগুলো যেন কোন পাতালপুরী থেকে ভেসে আসছে। কোনো জলতরঙ্গের তলা থেকে শোনা যাচ্ছে এ কণ্ঠস্বর। কিন্তু ঐ তো ওখানে দাঁড়িয়ে, ঐ শুভ্রবসনা নারীই তো কথা বলছে।

ছায়ামূর্তি বললো..... আমি তোমার অনেক পরিচিত...... তোমার বান্ধবী......

বান্ধবী? বনহুর কথাটা উচ্চারণ করলো।

ছায়ামূর্তি বললো—এখনও তুমি আমায় চিনতে পারছো না?

বনহুর ভাল করে তাকালো জ্যোছনার আলোতে, দেখতে পেলো একটা মুখ, বিবর্ণ ফ্যাকাশে করুণ নিষ্প্রভ মুখ। বনহুর বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—শাম্মী তুমি?

.... হাঁ, এবার আমায় চিনতে পেরেছো? এসো তবে আমার সঙ্গে....

বনহুর বললো— কোথায়?

...... যেখানে আমি থাকি।......

তুমি বেঁচে আছো শাম্মী?

.... এসো, সব বলবো.....

তোমার যে মৃত্যু হয়েছে?

...... সব জানতে পারবে, এসো....এগুতে লাগলো ছায়ামূর্তি। বনহুর ওর পিছনে পিছনে চললো।

কিছুদূর এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো ছায়ামূর্তি।

বনহুর অবাক হয়ে দেখলো এ সেই দেয়াল, যে দেয়াল ডিংগিয়ে একদিন সে মিঃ প্রিন্সের শোবার ঘরে প্রবেশ করেছিলো।

ছায়ামূর্তি আংগুল দিয়ে এক জায়গায় দেখিয়ে দিলো।

বনহুর দেখলো ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর ঐ জায়গায় এসে দাঁড়ালো, যে জায়গায় ছায়ামূর্তি

আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলো। বনহুর দেয়ালের এক জায়গায় একটা সুইচের মত দেখতে পেলো। মুহূর্ত বিলম্ব না করে সে ঐ সুইচে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের একটা অংশ ফাঁক হয়ে গেলো—দেখলো একটা ছোট তাক, তাকের উপরে একটা ঝকঝকে সুন্দর বাক্স। বাক্সটা বনহুর হাতে তুলে নিলো এবং খুলে ফেললো দ্রুতহস্তে।

বনহুর বাক্স খুলে ফেলতেই দেখলো তার মধ্যে রয়েছে একটা আংটি। বনহুর আংটি হাতে তুলে নিয়েই অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো—এ যে সেই আংটি, শাম্মীর মৃতদেহের হাত থেকে যা উধাও হয়েছিলো।

বনহুর আংটিটা হাতে নিয়ে তাকালো সম্মুখে, আবার সেই ছায়ামূর্তি অদূরে দাঁড়িয়ে আছে। বনহুরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

বনহুর তন্দ্রাচ্ছন্নের মত আংটি হাতে এগিয়ে চললো।

ছায়ামূর্তি এগিয়ে যাচ্ছে।

বনহুর ওকে অনুসরণ করলো।

বেশ কিছুদূর গিয়ে একটা গর্তের কাছে এসে দাঁড়ালো শাম্মী।

বনহুর তার কাছ থেকে কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে পড়লো। শাম্মী বললো..... আমি এখানেই থাকি.....

বনহুর অবাক কণ্ঠে বললো—এই অন্ধকারময় পচা গর্তে তুমি থাকো?

......হাঁ.....

না না, তুমি এখানে থেকো না শাম্মী। চলো আমি তোমায় নিয়ে যাবো। আমার কাছে থাকবে তুমি...... বনহুর ওকে হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলো। কিন্তু একি, কেউ তো নেই সেখানে।

বনহুরের মনটা হঠাৎ কেমন যেন শিউরে উঠলো, সত্যিই কি শাম্মীর অশরীরী আত্মা তাকে এতক্ষণ হাতছানি দিয়ে ডাকছিলো!

বনহুর গাড়িতে উঠে বসে, ফিরে আসে সে রহমান ও রামসিং এর কাছে।

সর্দারকে ফিরে আসতে দেখে খুশী হয় রহমান ও রামসিং। তারা সর্দারকে কুর্ণিশ জানায়।

বনহুর বলে—রহমান, এই দেখো আমি সেই আংটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি।

রহমান অবাক হয়ে বলে—সর্দার, ঐ আংটি আপনি কোথায় পেলেন? ওটা তো শাম্মীর হাতেই ছিলো?

হাঁ, শাম্মীই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো, যেখানে ছিলো তার আংটিটা।

শাম্মী!

হাঁ!

সর্দার, শাম্মী বেঁচে আছে?

না।

তবে যে আপনি বলছেন শাম্মী আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো?

শাম্মীর অশরীরী আত্মা.......

সর্দার! অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো রামসিং।

হাঁ, শাম্মীর অশরীরী আত্মাই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে।

রহমান বলে উঠে—আমি বলেছিলাম সর্দার ঐ ছায়ামূর্তি অন্য কিছু নয়, শাম্মীর অশরীরী আত্মা।

হাঁ, তোমার কথাই সত্য রহমান।

❑

বনহুর শয্যায় অর্ধশায়িত অবস্থায় গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছিলো। এমন সময় রহমান এসে দাঁড়ালো। সসম্মানে কুর্ণিশ জানিয়ে বললো—সর্দার!

বনহুরের কিন্তু খেয়াল নেই কোনোদিকে, সে তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবছে।

আজ ক'দিন থেকে রহমান লক্ষ্য করছে বনহুর সব সময় কেমন যেন আনমনা হয়ে থাকে। কি যেন গভীরভাবে চিন্তা করে সে।

এ নিয়ে রহমান আর রামসিংয়ের মধ্যে বেশ আলোচনা হয়েছে। এখানে আর অপেক্ষা করা মোটেই উচিত হবে না। যেমন করে হোক সর্দার সহ দেশে ফিরে যেতে হবে।

রহমান, এই কথা নিয়েই এ মুহূর্তে সর্দারের কাছে হাজির হয়েছে।

রহমানের কণ্ঠস্বর বনহুরের কানে পৌঁছেনি, সে যেমন বসেছিলো তেমনি বসে রইলো। বনহুরের দৃষ্টি সম্মুখের মুক্ত জানালা দিয়ে চলে গেছে অনেক দূরে, সীমাহীন ঐ আকাশে।

রহমান আবার ডাকলো—সর্দার!

এবার বনহুর চমকে উঠলো, চিন্তাজাল তার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। ফিরে তাকালো সে রহমানের দিকে।

রহমান বললো—সর্দার, এবার দেশে চলুন। কান্দাই আস্তানা থেকে কায়েস জানিয়েছে আপনার দেশে ফেরা একান্ত দরকার।

বনহুর ভ্রুকুঞ্চিত করে বললো—কেন?

অনেক দিন আপনি আস্তানা ছাড়া, তাই সবাই আপনার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে বৌরাণী আর নূরী......

জানি ওরা সবাই আমার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে, কিন্তু......

আর কোনো কিন্তু নয় সর্দার, এবার ফিরে চলুন। আপনার বৃদ্ধা আম্মা সাহেবা কতদিন আপনাকে না দেখে.....

আমি জানি! আমি জানি রহমান। সত্যি আমার মা আমার জন্য কেঁদে কেঁদে পাগলিনী হয়ে গেছেন। কতদিন আমি মা-হারা....বনহুরের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে।

এমন সময় রামসিং এসে দাঁড়ায়। তারও মুখোভাব গম্ভীর থমথমে। বলে রামসিং—সর্দার, মায়ের আশীর্বাদ ছাড়া সন্তানের কাছে সবই যে বৃথা। চলুন সর্দার, মায়ের আশীর্বাদ গ্রহণ করুন।

হাঁ, ঠিক বলেছো রামসিং, মায়ের আশীর্বাদ আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ। যাবো, কান্দাই ফিরে যাবো। আমার মা, আমার মনিরা, নূরী, আমার নূর, জাভেদ আর আমার দেশবাসী, সবাই কে কেমন আছে কতদিন জানি না। তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও।

বনহুরের কথায় রামসিং এবং রহমানের মুখে খুশীর আভাস ছড়িয়ে পড়লো। প্রধান অনুচরদ্বয় আনন্দদীপ্ত মনে বেরিয়ে গেলো সেখান থেকে।

❑

বনহুর ফিরে এলো কান্দাই তার আস্তানায়। রহমান আর রামসিংয়ের প্রচেষ্টা সার্থক হলো। সর্দার ফিরে আসায় আস্তানায় আনন্দের বন্যা বয়ে চললো। শুধু বনহুরের অনুচরদের মধ্যেই এই আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ পেলো না, এ আনন্দের উচ্ছ্বলতা সমস্ত কান্দাই জঙ্গলে আলোড়ন সৃষ্টি করলো।

জঙ্গলের গাছগুলো পর্যন্ত যেন সজীব হয়ে উঠেছে। পশুপাখীগুলোও যেন আনন্দে মেতে উঠেছে। ঝর্ণাগুলো আজ কল কল রবে বয়ে চলেছে।

তাজের তো খুশী আর ধরছে না। বনহুর যখন তাজের পিঠে হাত চাপড়ে আদর করলো তখন সে সম্মুখের পা দিয়ে বারবার মাটিতে আঘাত করতে লাগলো। আর চিঁ হিঁ চিঁ হিঁ শব্দ করে চললো। ওর মনের আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ পেলো ওর আচরণে।

এক সময় বনহুর প্রবেশ করলো তার বিশ্রামকক্ষে। নূরী একছড়া ফুলের মালা নিয়ে অপেক্ষা করছিলো, বনহুর কক্ষে প্রবেশ করতেই মালাছড়া পরিয়ে দিলো তার গলায়।

বনহুর ওকে টেনে নিলো কাছে। বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বললো—আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করো নূরী। জানতাম তুমি আমার উপর অভিমান বা রাগ করবে না।

নূরী স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে বললো—জানি তোমার উপর রাগ বা অভিমান করে কোন লাভ হবে না। বলো কেমন ছিলে?

বনহুর নূরীসহ খাটে বসে পড়লো।

নূরী বনহুরের জামার বোতাম খুলে দিতে দিতে বললো—কই, বললে নাতো বাংলাদেশে কেমন ছিলে?

বনহুর কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়লো, একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো সে—ভালো ছিলাম না নূরী।

কোনো অসুখ-বিসুখ হয়েছিলো তোমার?

না।

তবে? তবে কি অন্য কোনো বিপদ...

হ্যাঁ। কিন্তু আমার নিজের নয়, বাংলাদেশের মানুষের।

তাই বলো।

তুমি তো জানো অপরের ব্যথা-বেদনা বিপদ-আপদ সব যে আমার...

হুর তুমি চিরকাল এমনি পরের ব্যথা-বেদনা আর বিপদকে নিজের করে নেবে?

আমি যে জন্মেছি পরের জন্যে তা কি তুমি জানোনা নূরী?

জানি।

তবে কেন বারবার এ প্রশ্ন করো? যাক, এবার বলো তুমি কেমন ছিলে?

ও কথা তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করো না হুর।

কেন?

আমি জবাব দিতে পারবো না।

বনহুর বিছানায় চীৎ হয়ে শুয়ে পড়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললো—ভেবেছিলাম তুমি আমার উপর রাগ বা অভিমান করোনি, কিন্তু......

নূরী ওর মুখে হাতচাপা দিয়ে বলে—চুপ করো হুর! তুমি চুপ করো। জানোনা তুমি ছাড়া আমি কেমন থাকি? বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে নূরীর কণ্ঠ। চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে উঠে।

বনহুর পাশ ফিরে ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলে—একি চোখে পানি এনে ফেললে? না না, আজ চোখে পানি নয়। আনন্দ—শুধু আনন্দ নূরী। কতদিন আমি প্রাণ খুলে আনন্দ করিনি। কতদিন আমি প্রাণ খুলে হাসিনি। সর্বক্ষণ আমাকে একটা মায়াজাল আচ্ছন্ন করে তুলেছিলো। আমি যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম কোনো রূপকথার রাজ্যে।

এসব তুমি কি বলছো হুর?

হাঁ, তুমি শুনলে অবাক হবে নূরী। কিন্তু আজ আমি সে সব কথা বলতে রাজী নই।

তোমাকে বলতে হবে।

আজ নয়, পরে সব বলবো! আজ শুধু......বনহুর নূরীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে।

ঐ মুহূর্তে জাভেদ কক্ষে প্রবেশ করলো।

নূরী তাড়াতাড়ি বনহুরের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বললো—এখনও তোমার দুষ্টামি গেলোনা হুর।

ততক্ষণে জাভেদ বনহুর আর নূরীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। জাভেদের হাতে তীরধনুক। বনহুরকে দেখে কিন্তু জাভেদ বিস্ময় ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকায়।

নূরী জাভেদকে কাছে টেনে নিয়ে বলে—ওকে চিনতে পারছোনা জাভেদ?

অনেকদিন বনহুরকে দেখেনি জাভেদ, তাই কেমন যেন ভুলে গেছে ওকে। অবাক হয়ে দেখলো সে বনহুরকে তাকিয়ে তাকিয়ে।

নূরী বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো—জাভেদ শিকারে গিয়েছিলো, দেখছোনা ওর হাতে তীরধনুক।

বনহুর জাভেদকে এবার তুলে নিলো কোলে, তারপর ওর গালে চুমু দিয়ে বললো—আমাকে ভুলে গেছো? আমি তোমার আব্বু।

সঙ্গে সঙ্গে জাভেদের চোখ দুটো আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠলো। সে মায়ের মুখে শুনেছে তার আব্বু বাংলাদেশে গেছে।

কতদিন সে বিরক্ত করেছে তার মাকে, তখন ছোট থাকলেও এখন বেশ বড় হয়েছে—তার কত প্রশ্ন, কত কথা!

জাভেদ শিশু হলে কি হবে, সে সম্পূর্ণ তার পিতার স্বভাব পেয়েছে। এখন থেকেই তীরধনুক নিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। বাঘের বাচ্চার সঙ্গে লড়াই করে।

বনহুরের কথায় জাভেদ তার ছোট্ট বাহু দুটি দিয়ে পিতার গলা জড়িয়ে ধরে বলে—আব্বু, তুমি শিকারে যাবে না?

হাঁ, যাবো।

আমি মস্ত বড় বাঘ মারবো।

আচ্ছা মেরো। আমি তোমাকে সাহায্য করবো।

সত্যি বলছো আব্বু?

হাঁ, আমি তোমাকে......

নূরী স্বামীর মুখে হাতচাপা দিয়ে বলে—থাক থাক, ছেলেকে আর অত বড় শিকারী বানাতে হবে না।

ঠিক ঐ মুহূর্তে নাসরিন এসে হাজির হয়। তার কোলে ছোট্ট ফুটফুটে একটা মেয়ে।

বনহুর হেসে বলে—বাঃ চমৎকার মেয়ে! নাসরিন, এটা কে?

নূরী বলে উঠে—নতুন মানুষ।

নাসরিনের গন্ড রক্তাভ হয়ে উঠে।

বনহুর এগিয়ে এসে নাসরিনের কন্যার গালে মৃদু চাপ দিয়ে বলে—ভারী সুন্দর!

বনহুরের কথা মিথ্যা নয়, নাসরিনের কন্যাটি অদ্ভুত সুন্দর হয়েছে। নাক, মুখ, চোখে অপূর্ব এক দীপ্তময় ভাব।

বনহুর বললো—ওর নাম কি রেখেছো নাসরিন?

নাসরিন কিছু বলার পূর্বেই কক্ষে প্রবেশ করে রহমান, কুর্ণিশ জানিয়ে নম্রকণ্ঠে বলে—সর্দার, আমার ইচ্ছা ওর নাম আপনি রাখবেন।

হাসলো বনহুর।

নূরী বললো—হাঁ, তুমিই ওর একটা নাম রাখো হুর।

বনহুর শিশু কন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু ভেবে নিয়ে বললো—ফুল্লরা রাখলাম ওর নাম।

রহমান বললো—ভারী সুন্দর নাম সর্দার।

নূরী হাততালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে।

❑

হঠাৎ ঘুম ভেংগে গেলো মনিরার। কেউ যেন তার ঘরে প্রবেশ করে তার খাটের দিকে এগিয়ে আসছে বলে মনে হলো। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে, ভারী জুতোর শব্দ, ক্রমেই যেন আরও নিকটে মনে হচ্ছে। মনিরা চীৎকার করবে না চুপ করে থাকবে। এমন গভীর রাতে নিঃশব্দে কে তার বিছানার দিকে এগুচ্ছে ভেবে পায় না।

কক্ষ অন্ধকার।

মনিরা কক্ষে আলো জ্বেলে ঘুমাতে পারে না। ডিমলাইটটিও সে নিবিয়ে ঘুমায়। অন্ধকারে ভাবে ওর কথা। ওর কথা ভাবতে বড় ভাল লাগে মনিরার। যতক্ষণ আলো থাকে ততক্ষণ যেন ওকে নিবিড় করে ভাবতে পারে না। তাই অন্ধকার ভালবাসে সে। কিন্তু এমন একটা মুহূর্তের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলো না মনিরা।

শীতের রাতেও ঘেমে উঠলো মনিরার দেহ। লেপ মুড়ি দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে পড়ে রইলো।

পাশের ঘরে মামীমা আর নূর ঘুমাচ্ছে। সমস্ত চৌধুরীবাড়ি নিস্তব্ধ।

মনিরা দেখলো তার বিছানার পাশে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালো একটা ছায়ামূর্তি। তারপর বিছানায় তার পাশে বসলো।

সঙ্গে সঙ্গে মনিরা অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো—কে...কে তুমি?

মনিরার মুখে হাতচাপা দিয়ে শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললো—আমি।

তুমি! অন্ধকারে মনিরার চোখ দুটো খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

বনহুর মনিরার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বললো—ভয় পেয়ে গেছো মনিরা, না?

আজও তোমার সেই অভ্যাস গেলো না? চোরের মত চুপি চুপি না এলে কি নয়?

এতেই যে আমার আনন্দ মনিরা। অন্ধকারের আড়ালে তুমি আর আমি......

বাংলাদেশ জয় করে বড় কাব্যিক হয়েছো দেখছি। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরও তোমার সংগ্রাম কি শেষ হয়েছিলো না?

সত্যি আমার সংগ্রাম শেষ হয়নি এখনও মনিরা। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের মন স্বাধীন স্বচ্ছ হয়নি।

তার মানে?

মানে এখনও সেখানে শোষণ চলছে। চলছে দুর্নীতি অত্যাচার খুন খারাবি রাহাজানি।

তবে বেশিদিন বাংলাদেশে এই অনাচার আর চলবে না। লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্ত কোনো দিন বৃথা যেতে পারে না। জানো মনিরা, বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত করতে কত অমূল্য প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে।

জানি, সব আমি শুনেছি। আরও শুনেছি কত নারী তার ইজ্জত বিসর্জন দিয়েছে।

হাঁ মনিরা। খান সেনারা বাংলাদেশের বুকে যে ইতিহাস রচনা করেছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। কত নিরীহ মানুষকে ওরা হত্যা করেছে, কত মা-বোনের ইজ্জত ওরা লুটে নিয়েছে, কত মাকে ওরা সন্তানহারা করেছে......

চুপ করো, চুপ করো......আমি সব শুনেছি। রহমান আমাকে সব বলেছে।

যাক ওসব কথা, এখন বলো মনিরা তুমি কেমন আছো? মা কেমন আছে? নূর কেমন আছে? কতদিন তোমাদের ছেড়ে গিয়েছিলাম।

ওরা সবাই ভালো আছে তো?

আছে।

তুমি?

দেখতেই পাচ্ছো।

বড় রোগা হয়ে গেছো মনিরা। আমার জন্য বড্ড ভাবো।

আগে ভাবতাম এখন আর ভাবি না। জানি কোনোদিন তোমাকে ধরে রাখতে পারবো না।

লক্ষ্মীটি, মিথ্যা অভিমান করছো। এবার থেকে আর কোথাও যাবো না।

অমন কতবার বলেছো কিন্তু কথা রাখতে পেরেছো?

সে কথা মিথ্যা নয় মনিরা—তবে এবার থেকে চেষ্টা করবো সব সময় তোমাদের পাশে থাকতে। আর কোনো মান-অভিমান নয়...... বনহুর মনিরাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে।

স্বামীর বুকে মাথা রাখে মনিরা। কতদিন পর আজ সে স্বামীকে একান্ত নিবিড় করে পেয়েছে। মনিরার চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

❑

একটা তীব্র আর্তনাদের শব্দ।

ঘুম ভেঙ্গে গেলো মনিরার। চোখ মেলতেই দেখলো বনহুর তার পূর্বেই জেগে বিছানায় উঠে বসেছে। চোখেমুখে তার একটা উদ্বিগ্নতার ছাপ। কান পেতে শুনছিলো বনহুর শব্দটা।

ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে উঠে মনিরার মুখ, চাপাকণ্ঠে বললো—আজ আবার কে খুন হলো?

বনহুর অবাক কণ্ঠে বললো—খুন!

হাঁ, প্রতি অমাবস্যা রাতে কান্দাই শহরে একটা করে মানুষ খুন হচ্ছে।

বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো মনিরার মুখে।

মনিরা বললো—তুমি শোনোনি এ কথা?

না! সব খুলে বলো মনিরা, কারণ আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

দু'মাস ধরে এক বিস্ময়কর হত্যাকান্ড এই কান্দাই শহরের বুকে ঘটে চলেছে। প্রতি অমাবস্যা রাতে শহরের যে কোনো জায়গায় একটা খুন হবেই। যে মৃতদেহগুলো পাওয়া গেছে, শুনেছি প্রতিটি মৃতের চোখ দুটো উপড়ে ফেলা হয়েছে এবং বুকের বামপাশে একটা ক্ষতচিহ্ন।

বনহুর অস্ফুট কণ্ঠে বললো—মৃতের চোখ দুটো উপড়ে ফেলা হয় আর বুকের বামপাশে ক্ষত চিহ্ন?

হাঁ। আরও শুনেছি চিহ্নটা কোনো হিংস্র জন্তুর নখের আঁচড়।

বনহুরের মুখে চিন্তার ছাপ ফুটে উঠলো। কি যেন ভাবছে সে গভীরভাবে।

ততক্ষণে আর্তনাদের শব্দ থেমে গেছে। নিস্তব্ধ জমাট অন্ধকারে ভেসে আসছে ঝিঁ ঝিঁ পোকার অবিশ্রান্ত আওয়াজ।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো—দেখি আমি কোথায় এ হত্যাকান্ড ঘটলো। টেবিল থেকে নিজের রিভলভারখানা তুলে নিয়ে পকেটে রাখলো।

মনিরা খাট থেকে নেমে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো বনহুরকে—না না যেতে দেবো না। ঐ ভয়ঙ্কর জন্তুটা তোমাকে হত্যা করে ফেলবে। তোমাকে যেতে দেবো না।

মনিরা, আমি এক্ষুণি ফিরে আসবো। বনহুর তার বলিষ্ঠ হাতে মনিরার হাত দু'খানা মুক্ত করে নিয়ে পিছনের জানালা দিয়ে বেরিয়ে পাইপ বেয়ে নেমে গেলো।

মনিরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইলো উন্মুক্ত জানালা দিয়ে বাইরের জমাট অন্ধকারের দিকে।

বনহুর তর তর করে নেমে এলো নীচে। যে দিক থেকে শব্দটা এসেছিলো সেই দিক লক্ষ্য করে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চললো। প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভারখানা বের করে হাতে নিলো সে।

সম্মুখে বাগান পেরিয়ে প্রশস্ত রাজপথ। অদূরে লাইটপোষ্টগুলো সজাগ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুর বাগান পেরিয়ে বড় রাস্তার পাশে একটা পাইন গাছের আড়ালে এসে দাঁড়ালো। লাইটপোষ্টের আলোতে যতদূর দেখা যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলো বনহুর। না, কোথাও কিছু নজরে পড়ছে না। শুধু জনহীন রাজপথ খাঁ খাঁ করছে।

বনহুর আরো এগুলো।

চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি।

দক্ষিণ হাতে গুলীভরা রিভলভার।

শীতের হাওয়া বইছে।

লাইটপোষ্টের আলোগুলোকে কেমন যেন নিষ্প্রভ লাগছিলো।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো বনহুর। সে দেখতে পেলো রাস্তার ওপাশে জমাট অন্ধকারে দুটো চোখ যেন জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। দেহটা মোটেই নজরে পড়লো না, তবে মনে হলো কোনো একটা লোমশ দেহ ওখানে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে।

বনহুর রিভলভার তুলে ধরে সঙ্গে সঙ্গে গুলী ছুড়লো, একটি দু'টি তিনটি। কিন্তু কোনো আর্তনাদ বা চীৎকার শোনা গেলো না।

আবার সেই নিস্তব্ধতা।

বনহুর এগুলো। যেখানে দুটো চোখ জ্বলজ্বল করে জ্বলছিলো সেখানে এসে দাঁড়ালো সে, দৃষ্টি ফেললো চারদিকে। হঠাৎ নজর চলে গেলো অদূরে লাইটপেষ্টোর আলোতে। দেখলো এক বীভৎস নৃশংস দৃশ্য—একটা অর্ধ উলঙ্গ নারীদেহ পড়ে আছে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে এগিয়ে গেলো মৃতদেহটার পাশে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখলো নারী দেহটার বুকের বামপাশ থেকে হু হু করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। সমস্ত মুখখানা রক্তাক্ত। চোখের মণি দুটো টেনে তুলে নেওয়া হয়েছে।

বনহুর হাঁটু গেড়ে লাশটার পাশে এসে পড়লো, এপাশ ওপাশ করে দেখছে ঠিক ঐ মুহূর্তে একটা শব্দহীন গাড়ি এসে থেমে পড়লো সেখানে।

বনহুর মনোযোগ সহকারে লাশ পরীক্ষা করে দেখছিলো, কাজেই তার খেয়াল ছিলো না কোনোদিকে।

গাড়িখানা পুলিশ ভ্যান।

গাড়ি থেমে পড়তেই দশ-বারোজন পুলিশ বনহুরের চারপাশ ঘিরে দাঁড়ালো। প্রত্যেকের হাতেই রাইফেল।

বনহুর ফিরে তাকাতেই চোখ দুটো তার জ্বলে উঠলো, মুখমন্ডল কঠিন হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো বনহুর। একবার সে প্রত্যেকটা পুলিশের মুখে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো।

বনহুর দেখলো তার পরিচিত পুলিশ অফিসার কেউ নেই তাদের মধ্যে। এবার বনহুর নিজেকে প্রস্তুত করে নিলো, তারপর বললো—আমি এই পথে যাচ্ছিলাম হঠাৎ দেখি একটা মৃতদেহ। তাই ভাবছিলাম......

বনহুরের শরীরে ছিলো জমকালো পোশাক, মাথায় পাগড়ী; কোমরের বেল্টে ছোরা, দক্ষিণ হাতে রিভলভার। তাকে সন্দেহ করা স্বাভাবিক।

একজন পুলিশ অফিসার বলে উঠলেন—আমরা জানি তুমি কে, এবং তুমিই এসব হত্যা করে চলেছো।

বনহুর বললো—না, বিশ্বাস করুন আমি এ হত্যা সম্বন্ধে কিছু জানি না। আমি একজন পথিক।

পুলিশ অফিসারটা আরও দু'পা সরে এলেন। সবাই মিলে তখন ঘিরে আছে বনহুরকে। পুলিশ অফিসার পকেট থেকে একটা ফটো বের করে মেলে ধরলেন বনহুরের সামনে—বলো এটা কার ফটো?

বনহুর তাকালো পুলিশ অফিসারটার হাতের ফটোখানার দিকে। অদূরস্থ লাইটপোষ্টের আলোতে সে স্পষ্ট দেখতে পেলো ঐ ফটোখানা তার নিজের ছবি।

পুলিশ অফিসারটা তীক্ষ্ণ কঠিন কণ্ঠে বললো—এবার বুঝতে পেরেছো পরিচয় না দিলেও আমরা জানি তুমি কে। একটু থেমে বললো আবার সে—আমরা পূর্ব হতেই সন্দেহ করেছিলাম এ হত্যালীলা দস্যু বনহুরের কাজ ছাড়া কারও নয়।

বনহুর এখন বুঝতে পারলো সে কান্দাই না থাকলেও তাকে এই হত্যাকান্ডের নায়ক বলে পুলিশ মনে সন্দেহ করে চলেছে এবং সে কারণেই নতুন আমদানী পুলিশ মহল তার ছবি সংগ্রহ করে তাকে অনুসন্ধান করে ফিরছে। আজ ওদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে, ওদের সন্দেহ সত্যে পরিণত হয়েছে।

পুলিশ অফিসারটা বনহুরকে ভাবতে দেখে বললো—কি ভাবছো, তোমার হত্যালীলা আজ থেকে সাঙ্গ হলো।

বনহুর কোনো জবাব দিলো না, সে জানে তার কোনো কথাই ওরা এখন বিশ্বাস করবে না।

পুলিশ অফিসারটা বলে উঠলেন—এবার নিজের কর্মফলের জন্য প্রস্তুত হও বনহুর। পুলিশদের ইংগিত করলেন বনহুরের হাতে হাত কড়া পরিয়ে দিতে।

ইতিপূর্বে বনহুর রিভলভারখানা প্যান্টের পকেটে ভরে নিয়েছিলো। হাত দু'খানা তার মুক্ত ছিলো।

পুলিশ অফিসারের ইংগিতে পুলিশদের মধ্য হতে একজন হাতকড়া নিয়ে এগিয়ে এলো বনহুরের পাশে।

অন্যান্য পুলিশ উদ্যত রাইফেল বাগিয়ে ধরে তার চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে। পাশে রাস্তায় মৃতদেহটা পড়ে আছে। লাইটপোষ্টের আলোতে মৃতদেহটার চাপ চাপ তাজা রক্ত টক্ টক্ করছে।

বনহুর একবার দেখে নিলো মৃতদেহটাকে। তারপর হাত দু'খানা বাড়িয়ে দিলো।

পুলিশ যেমনি তার হাতে হাতকড়া পরাতে গেলো অমনি প্রচন্ড এক ধাক্কায় পুলিশটাকে ছুড়ে দিলো পুলিশ অফিসারটার গায়ে, তারপর এক লাফে পুলিশবুহ্য ভেদ করে বেরিয়ে এলো বাইরে।

পুলিশটির ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলো পুলিশ অফিসারটি। পুলিশরা এমন একটা অবস্থার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। প্রথমে কেউ গুলী ছুড়তে সাহসী হলো না, হঠাৎ যদি তাদের নিজেদের কারও গায়ে গুলী বিদ্ধ হয়।

পুলিশ অফিসারটাকে দু'জন পুলিশ ধরাধরি করে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলো।

ততক্ষণে পুলিশটাও হাতকড়া হাতে উঠে দাঁড়িয়েছে।

পুলিশ অফিসার তার দলবলকে লক্ষ্য করে চীৎকার করে উঠলো—গুলী চালাও! গুলী চালাও...

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ বাহিনীর রাইফেল গর্জে উঠলো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে অদূরে শোনা গেলো তাজের খুরের শব্দ খট্...খট্...খট্...খট্

মনিরা উন্মুক্ত জানালায় দাঁড়িয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিলো। প্রতীক্ষা করছিলো তার স্বামী আবার ফিরে আসবে। বিলম্ব দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিলো সে। অজানা অমঙ্গল আশঙ্কায় বুকটা তার দূর দূর করে কাঁপছিলো। হঠাৎ নিস্তব্ধ অন্ধকার ভেদ করে যখন গুলীর শব্দ ভেসে এলো তার কানে তখন মনিরা চিৎকার করে কেঁদে উঠলো।

পাশের ঘর থেকে ছুটে এলো নূর। মাকে এত রাতে পিছন জানালার অন্ধকারে তাকিয়ে কাঁদতে দেখে অবাক কণ্ঠে বললো—কি হয়েছে আম্মি? অমন করে এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছো কেন?

না না, কিছু না...কিছু না...মনিরা আঁচলে চোখ ঢেকে আরও জোরে কেঁদে উঠে।

ঐ সময় মনিরা আর নূরের কানে ভেসে আসে ঘোড়ার খুরের শব্দ খট্...খট্...খট্

মুহূর্তে মনিরা মুখ থেকে আঁচল সরিয়ে কান পেতে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। চোখ দুটো যেন খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

নূর মায়ের মুখোভাব লক্ষ্য করে অবাক হয়। সে বলে উঠে—আম্মি, তোমার কি হয়েছে? বলোনা আম্মি?

ওর গায়ে গুলী লাগেনি রে!

কার গায়ে? কার গায়ে গুলী লাগেনি আম্মি?

এতক্ষণে হুশ হলো মনিরার। একি তার গোপন কথা ফাঁস হতে চলেছে। নূর কি মনে করছে তাকে। নূর তো এসব কিছু জানে না। বলে উঠে মনিরা—হঠাৎ আমি কেমন যেন সজ্ঞাহারা হয়ে পড়েছিলাম ওদিকে গুলীর শব্দ শুনে, বুঝলি না বাবা...

তুমি এত অবুঝ আম্মি! চলো, ঘুমাবে চলো।

মনিরা ফিরে আসে তার নিজের বিছানায়।

নূর ওপাশের জানালাটা ভালভাবে বন্ধ করে ফিরে আসে মায়ের বিছানার পাশে, বলে—আম্মি, তুমি ঘুমাও, আমি তোমার পাশে বসছি।

না বাবা, তোমাকে বসতে হবে না। যাও ঘুমাও, যাও।

তুমি তো ভয় পাবে না?

না।

বেশ, আমি যাচ্ছি। নূর মাঝের দরজা দিয়ে চলে যায় পাশের ঘরে।

❑

নূর হন্তদন্ত হয়ে ছুটো এলো মায়ের ঘরে; হাতে তার একটা পত্রিকা। ব্যস্তকণ্ঠে বললো—আম্মি—আম্মি, এই দেখো...

মনিরা কোনো কাজ করছিলো, পুত্রের দিকে ফিরে তাকাতেই নূর পত্রিকার এক জায়গায় আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বলে—কাল তুমি যে গুলীর শব্দ শুনেছিলে সেটা পুলিশ বাহিনীর গুলীর শব্দ। এই দেখো দস্যু বনহুর কাল গ্রেপ্তার হয়েও হয়নি। পুলিশ পাকড়াও করেছিলো আর কি, কিন্তু সামান্যের জন্য সে পালাতে সক্ষম হয়েছে।

মনিরা তখন পত্রিকাখানা হাতে নিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়ছিলো।

নূর বলেই চলেছে—আমি প্রথমেই সন্দেহ করেছিলাম এ হত্যালীলা স্বয়ং দস্যু বনহুরের কাজ।

চুপ কর্ হতভাগা, নিজে না জেনে না দেখে কিছু বলবি না!

আম্মি, তুমি সব সময় দস্যু বনহুরকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চাও কিন্তু পত্রিকার সংবাদ তো আর মিথ্যা হতে পারে না?

মনিরা পুত্রের কথার কোনো জবাব দেয় না। মুখখানা তার গম্ভীর ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে।

নূর বলে—আম্মি, পত্রিকা পড়ে সব বুঝলে তো? দস্যু বনহুর কত সাংঘাতিক নরঘাতক।

দুশ্চিন্তায় মনিরার মনটা ভরে উঠে। তখনও তার কানের কাছে যেন সেই গুলীর শব্দের প্রতিধ্বনি হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ।

মনিরা বেরিয়ে গেলো সেখান থেকে, পুত্রের কথার কোনো জবাব দিলো না।

❑

পরদিন।

পুলিশ অফিসে সেদিন মহা হুলস্থুল পড়ে গেছে। দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করেও করতে সক্ষম হয়নি, এটাই শোর হাঙ্গামার একমাত্র কারণ। সমস্ত শহরে একটা আতঙ্কের ছাপ বিদ্যমান।

বেশ কিছুদিন পুলিশমহল বনহুরের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিলো, আবার তাদের মধ্যে ভীষণ একটা চাঞ্চল্য দেখা দিলো। সবাই হন্তদন্ত হয়ে শহরময় ছুটাছুটি শুরু করে দিয়েছে।

গত রাতের ব্যাপারে পুলিশ আরও ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাদের আরাম বিরাম সব উবে গেছে যেন। বিশেষ করে পুলিশমহল সঠিকভাবে জানতে পেরেছে যে, এই রহস্যময় হত্যাকান্ড স্বয়ং দস্যু বনহুর দ্বারাই সংঘটিত হয়ে চলেছে। লাশ মর্গে পাঠানোর পর ডাক্তারী রিপোর্টে যদিও জানা গেছে এসব হত্যা কোনো অস্ত্রের দ্বারা সংঘটিত হয়নি। এ হত্যাকান্ডে যা ব্যবহার করা হয় তা কোনো জন্তুর নখ বা দাঁত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পুলিশমহলের মনে এতদিন একটা সন্দেহের দোলা নাড়া দিলেও আজ তারা নিশ্চিন্ত হয়েছে যে দস্যু বনহুরই এ হত্যাকান্ডের মূল। তাই পুলিশমহলের চিন্তা আর উদ্বিগ্নতা খুব বেড়ে গেছে।

পুলিশ অফিসে বসে কয়েকজন পুলিশ অফিসার ব্যস্ততার সঙ্গে কি সব আলোচনা করে চলেছেন।

গত রাতের লাশটা মর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, এখনও তার কোনো রিপোর্ট আসেনি। সবাই বেশ আতঙ্ক আর উদ্বিগ্নতার সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। চোখেমুখে তাঁদের দুশ্চিন্তার ছাপ।

মিঃ জাফরীকে টেলিগ্রাফ করা হয়েছে। আজকেই তিনি হিন্দল থেকে এসে পড়বেন। দস্যু বনহুর সম্পর্কে মিঃ জাফরীর যতখানি অভিজ্ঞতা রয়েছে ততখানি অন্য কোনো পুলিশ অফিসারের নেই।

দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে মিঃ জাফরী বহুদিন কান্দাই শহরে ছিলেন। কিছুদিন হলো তিনি হিন্দল বদলী হয়ে গেছেন।

পুলিশমহলে যখন দস্যু বনহুর নিয়ে জোর আলোচনা চলছে তখন দস্যু বনহুর তার আস্তানায় রহমানের সঙ্গে গত রাতের ব্যাপার নিয়ে আলাপ করছে।

এ হত্যাকান্ড অত্যন্ত রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে সর্দার। নিশ্চয়ই কোনো জন্তু দ্বারা এ হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়ে চলেছে। কথাগুলো বলে থামলো রহমান।

বনহুর একটা পাথরে বসে আর একটা পাথরে ঠেশ দিয়ে সিগারেট টানছিলো। তার চোখেমুখে চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে। রহমানের কথায় বনহুর একমুখ ধোয়া ছেড়ে বললো—না, এ হত্যা জন্তু দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে না। নিশ্চয়ই এর পিছনে কোনো ব্যক্তির রহস্যময় হাত খেলা করছে। তোমার হয়তো মনে আছে রহমান, বেশ কিছুদিন আগে কান্দাই শহরে এমনি একটা হত্যারহস্য কান্দাইবাসীর মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিলো।

হাঁ সর্দার, বেশ মনে আছে, সেই হত্যারহস্য আপনি উদঘাটন করেছিলেন। এক নর-শয়তান মানুষ হত্যা করে তাদের রক্ত নিয়ে বিদেশে চালান দিতো।

হাঁ, আমি তাকে সমুচিত শাস্তি দিয়েছিলাম। আমার মনে হয় এমনি কোনো দুষ্ট বৈজ্ঞানিক তার কোনো সাধনা চরিতার্থে এ হত্যাকান্ড করে চলেছে। রহমান, তুমি এবং কায়েস ছদ্মবেশে কান্দাই শহরে যাও। সন্ধান করো কে এই হত্যালীলা শুরু করেছে। একটু থেমে বললো—আমি যাবো রাত্রির অন্ধকারে, সমস্ত শহর তন্ন তন্ন করে দেখবো। তোমরা দিনের বেলায় ছদ্মবেশে কাজ করবে।

সর্দার, আমরাই এর সন্ধান এনে দেবো। অযথা আপনি হয়রান হবেন না, কারণ আপনার শরীর...

রহমান, সব সময় আমার প্রতি তোমার এ দুর্বলতা কেন? কে বললো আমার শরীর ভাল না?

এমন সময় নূরী এসে দাঁড়ালো, বললো—আমি বলছি তোমার শরীর মোটেই ভাল না।

কি করে বুঝলে?

প্রায়ই তুমি বিষণ্ন মনে কি যেন ভাবো।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো বনহুর, তারপর হাসি থামিয়ে বললো—বিষণ্ন মনে কিছু ভাবলেই বুঝি শরীর খারাপ হয়? যতসব বাজে কথা।

নূরীর অভিমান হলো, রাগত কণ্ঠে বললো—বেশ, আমি আর তোমার সঙ্গে কথা বলবো না।

কেন?

আমার সব বাজে কথা।

সব কথা নয়, মানে আমার শরীর নিয়ে তুমি প্রায়ই বাজে কথা বলো। আমি তো বেশ আছি, মোটেই আমার শরীর খারাপ নয়।

তাহলে কি ভাবো অমন করে?

বনহুর একটু হেসে বললো—পরে বলবো।

বেশ, যাচ্ছি। তোমাদের আলোচনার মধ্যে আমি থাকতে চাইনা।

হাঁ, তুমি এখন যাও নূরী, অনেক জরুরী কথা আছে।

নূরী অভিমানে মুখ ভার করে চলে গেলো।

বনহুর পুনরায় একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো। কয়েকমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো—এখনও ওর ছেলেমানুষী গেলো না।

রহমান গম্ভীর গলায় বলে—সর্দার, নূরী যা বলে তা মোটেই ছেলেমানুষি নয়। কারণ আপনি কোনোদিন নিজের দিকে খেয়াল করেন না। শুধু তাই নয়, আপনি নূরীর দিকে বা সন্তানের দিকেও লক্ষ্য দেন না।

রহমান, এ কথা তোমার মুখে শোভা পায় না। যাক ও সব কথা—এখন কাজের কথায় আসা যাক। আজ কান্দাই এরোড্রামে যেতে হবে, মিঃ জাফরী আসছেন।

মিঃ জাফরী!

হাঁ। দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য তাঁকে হিন্দল থেকে আনা হচ্ছে!

সর্দার!

তাজকে প্রস্তুত করতে বলো, আমি মিঃ জাফরীর সঙ্গে দেখা করতে যাবো।

আপনি মিঃ জাফরীর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন।

হাঁ, কারণ মিঃ জাফরীর সঙ্গে অনেকদিন সাক্ষাৎ ঘটেনি। বনহুর এবার তার পাথরাসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো।

রহমান কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর এগিয়ে চললো তার বিশ্রামকক্ষের দিকে।

একটু পূর্বে নূরী অভিমান করে চলে এসেছে।

অবশ্য তার অভিমান করার কারণ আছে অনেক। বনহুর বাংলাদেশ থেকে আসার পর নূরী ওকে এক মুহূর্তও নিবিড় করে পায়নি। যতক্ষণ বনহুর অনুচরদের নিয়ে কাটায় ততক্ষণ তার জন্য প্রতীক্ষা করে নূরী। যখন সে আসে তার পাশে তখন কেমন যেন আনমনা লাগে। কি যেন ভাবে ও আপন মনে।

নূরী আগের মত একান্ত করে যেন ওকে আর পায় না। এ কারণেই নূরীর এত অভিমান।

বনহুর তার বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করতেই জাভেদ ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে তার পিতাকে—আব্বু! আব্বু....

বনহুর ওকে তুলে নেয় কোলে—বলো আব্বু?

এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? বনহুরের গলা জড়িয়ে ধরে প্রশ্ন করে জাভেদ।

জাভেদের কচি গালে চুমু দিয়ে বলে বনহুর—কেন, তোমার বুঝি খুব খারাপ লেগেছিলো?

তোমাকে না দেখলে খারাপ লাগবেনা? আম্মি বলতো তুমি যুদ্ধ করতে গেছো।

হাঁ আব্বু, যুদ্ধই বটে।

কোথায় সে যুদ্ধ আব্বু।

বাংলাদেশে।

তুমি বাংলাদেশে গিয়েছিলে?

হাঁ।

বাংলাদেশ কেমন আব্বু?

চমৎকার সুন্দর একটা দেশ। সেখানে চারদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। তুমি বড় হয়ে যেও, কেমন?

অদূরে নূরী কিছু করছিলো, অভিমানভরা গলায় বলে উঠে—থাক, তুমি গেছো সেই ভাল। ওকে আর যেতে হবে না।

বনহুর হেসে বলে—শুনছো, জাভেদ তোমার আম্মি কি বলে? তোমাকে বাংলাদেশে যেতে দেবে না।

জাভেদ মুখ গম্ভীর করে বলে উঠলো—আমি যাবো। আম্মি যেতে না দিলে আমি পালিয়ে যাবো।

বনহুর এবার অট্টহাসি হেসে উঠলো—শুনলে তো তোমার ছেলের কথা!

নূরী রাগতভাবে বনহুরের দিকে তাকিয়ে বললো—শুনেছি। যেমন বাপ তার তেমন ছেলে হবে এতে আর কি।

বনহুরের কোল থেকে জাভেদকে নীচে নামিয়ে দিয়ে বলে সে—যাও জাভেদ, বাইরে খেলবে যাও।

জাভেদ মায়ের কথায় কোনো জবাব না দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর এবার নূরীর হাতখানা খপ্ করে ধরে ফেলে টেনে নিলো কাছে। ওকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বললো—নূরী, আর তোমাকে ছেড়ে দেবো না।

আঃ ছাড়ো...ছাড়ো বলছি...

উঁ, হু ছাড়বো না। বনহুর ওকে আরও নিবিড় করে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে।

ঐ মুহূর্তে বাইরে রহমানের ব্যস্তকণ্ঠ শোনা যায়—সর্দার, সর্দার......

বনহুর নূরীকে মুক্ত করে দিয়ে বেরিয়ে আসে—কি সংবাদ রহমান?

রহমানের চোখেমুখে দারুণ উৎকণ্ঠার ছাপ, ব্যস্তকণ্ঠে বলে উঠে—সর্দার, জম্বু থেকে বিপদ সংকেত এসেছে। একদল জংলী নাকি জম্বু আস্তানা আক্রমণ করেছে।

বনহুরের মুখমন্ডল মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠে, বলে সে—জম্বু আস্তানা জংলীরা আক্রমণ করেছে?

হাঁ সর্দার।

চলো।

বনহুর আর রহমান ওয়্যারলেস কক্ষের দিকে এগিয়ে চললো।

ওয়্যারলেস কক্ষে প্রবেশ করে দেখলো জম্বু আস্তানার সংকেত আলো জ্বলছে আর নিভছে। বনহুর ওয়্যারলেস রিসিভার তুলে নিলো হাতে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো তার অগ্নিরূপ ধারণ করলো।

ওয়্যারলেসে মাত্র কয়েকটা কথা হলো বনহুর ও জম্বু আস্তানার প্রধান অনুচরের মধ্যে।

রহমান পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলো।

রহমান ছাড়া আর কোনো অনুচর ছিলো না সেখানে। বনহুর কথা শেষ করে ফিরে তাকালো রহমানের দিকে, মুখমন্ডল তার গম্ভীর কঠিন হয়ে উঠেছে।

বনহুর বললো—এই মুহূর্তে আমি জম্বু রওনা দেবো রহমান, প্রস্তুত হয়ে নাও।

বনহুর কথাটা বলে বেরিয়ে গেলো ওয়্যারলেস কক্ষ থেকে।

রহমান নিজে প্রস্তুত হয়ে নেবার আয়োজনে বেরিয়ে গেলো।

সমস্ত আস্তানায় বিপদ সংকেত ধ্বনি হতে শুরু করলো। বনহুরের অনুচরদের মধ্যে একটা চঞ্চলতা পরিলক্ষিত হলো।

রহমান যখন ব্যস্তসমস্ত হয়ে তার অস্ত্রশস্ত্র ঠিক করে নিচ্ছিলো তখন নাসরিন তার শিশুকন্যা ফুল্লরাকে নিয়ে হাজির হলো তার সম্মুখে।

স্বামীকে লক্ষ্য করে বললো নাসরিন—আবার চললে?

হাঁ।

কিন্তু কোথায় যাচ্ছো তা তো বললে না?

জম্বুতে যাচ্ছি। জম্বু আস্তানায় জংলীরা হানা দিয়েছে।

জম্বু জঙ্গলের জংলী, সে তো অতি ভয়ঙ্কর?

হাঁ, খুব ভয়ঙ্কর। ওরা জানোয়ারের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

আমার কিন্তু বড় ভয় করছে।

দস্যুকন্যা আর দস্যু-স্ত্রী হয়ে এ কথা মুখে আনতে পারলে নাসরিন?

জানি না ভাগ্যে কি আছে। এক বিপদ না কাটতেই আবার এক বিপদ।

বিপদ কোথায়—এ তো কাজ।

কাজ?

হাঁ, কাজ ছাড়া কি বলবে? আস্তানা শত্রু আক্রমণ করেছে, আমরা রক্ষা করতে যাচ্ছি।

যেমন সর্দার তেমনি তার সহচর—বিপদকে কাজ বলে মাথা পেতে গ্রহণ করে।

নাসরিন, এসব কথা তোমার মুখে শোভা পায় না। শোভা পায় না নূরীর মুখে, কারণ তোমরা বীর নারী। দরকার হলে তোমরা আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। দেখো, আমার মা-মনি ফুল্লরা বড় হলে আমি ওকে সঙ্গে করে যুদ্ধে যাবো। সংগ্রাম শিখাবো—অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে সংগ্রাম করবে। কথাটা বলে রহমান তার শিশুকন্যার চিবুকে মৃদু চাপ দেয়।

ফুল্লরা পিতার কথাগুলো যেন অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছে, তাই সে হেসে উঠে ফিক করে।

নাসরিন অভিমানভরা কণ্ঠে বলে—হবে না? যেমন বাপ তেমন তার মেয়ে। কেমন হাত-পা ছুড়ে হাসছে দেখো।

রহমানের ততক্ষণে পিঠে রাইফেল বাঁধা হয়ে গেছে। সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরাখানা তুলে নিয়ে খাপে রাখতে রাখতে বললো—ফুল্লরা আমাদের সঙ্গে যাবে বলে অমন করছে।

নাসরিন বললো—নিয়ে যাও ওকে।

একটু বড় হলে তোমাকে আর বলতে হতো না। আমার সঙ্গে ও এমনিই চলে যেতো।

যাও, তোমার এত নেকামি আর করতে হবে না।

রহমান নাসরিনের নাকটা ধরে একটু চাপ দিয়ে বলে—বেশ যাচ্ছি। যদি ফিরে না আসি তবে খুব খুশি হবে, তাই না?

হঠাৎ নাসরিনের মুখখানা গম্ভীর থমথমে হয়ে উঠলো, একটা অজানা আশঙ্কা তার হৃদয়ে নাড়া দিলো, বললো—যাবে যাও কিন্তু এমন কুলক্ষুণে কথা বলো কেন? সত্যি তোমার যদি কোনো বিপদ ঘটে, আমি আত্মহত্যা করবো।

হাসলো রহমান, তারপর বললো—তোমরা নারীজাত এত দুর্বল! হঠাৎ যদি কোনো বিপদ আসে তাতে নিজের প্রতি অন্যায় করবে, বলো? ফুল্লরা আছে, ওকে মানুষ করার দায়িত্ব তোমার।

চুপ করো, আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না।

বেশ, চলি তাহলে?

এসো।

বেরিয়ে যায় রহমান।

আস্তানার ফটকে এগুতেই নজরে পড়ে বনহুরের গলায় ওড়না দিয়ে ধরে আছে নূরী, দু'চোখে তার ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ছে।

বনহুরের শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো রহমানের কানে—ছিঃ লক্ষ্মীটি, বাধা দিও না।

নূরীর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠস্বর...আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো।

বনহুরের গলা...তা হয় না। জম্বুর জংলীরা অতি ভয়ঙ্কর। ওখানে তুমি যেতে চেয়ো না নূরী।

কোথায় তুমি স্বেচ্ছায় আমাকে নিয়ে গেছো বলো?

ছেড়ে দাও, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

নূরী পূর্বের মত ওড়না এঁটে ধরে বলে—না, আমি তোমাকে যেতে দেবো না।

এত করে বোঝালাম তবু ছেলেমানুষি করবে?

রহমান অদূরে দাঁড়িয়ে হাসলো, একটু পূর্বে নাসরিনের কথাগুলো তার কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। একটু কেশে বললো—সর্দার!

এবার নূরী বনহুরের কণ্ঠ থেকে তার ওড়নাখানা সরিয়ে নিয়ে একপাশে মুখভার করে দাঁড়িয়ে রইলো।

বনহুর বললো—চলো রহমান।

আস্তানার বাইরে বেরিয়ে এলো রহমান আর বনহুর।

বাইরে কয়েকজন অনুচর তাজ আর দুলকীকে নিয়ে অপেক্ষা করছিলো।

বনহুর এসে তাজের লাগাম ধরলো।

রহমান দুলকীর।

অন্য সময় বনহুর তাজের কোনো লাগাম ব্যবহার করে না। যখন কোনো যুদ্ধ বা সংগ্রামে তাজকে সে ব্যবহার করে তখন তাজের লাগাম ব্যবহার করে সে।

তাজের পিঠে চেপে বসতেই তাজ সম্মুখের পা উঁচু করে চিঁহিঁ চিঁহিঁ শব্দ করে উঠে।

দুলকীও তাজের মত সম্মুখের পা দু'খানা তুলে শব্দ করে তারপর দুটি অশ্ব একসঙ্গে ছুটতে শুরু করে।

তীরবেগে ছুটে চলেছে তাজ আর দুলকী।

❑

বনহুরের জম্বু আস্তানার তিন পাশে ছিলো সীমাহীন জলরাশি আর একপাশে ছিলো জম্বু পর্বত এবং জঙ্গল।

ঠিক পর্বতের পাদমূলে একটা গুহায় এ আস্তানা। আশেপাশে আরও কয়েকটা ছোটবড় গুহা রয়েছে যেখানে প্রচুর অস্ত্র গোলাবারুদ এবং ধনরত্ন রাখা হয়েছে।

জম্বুর অদূরে ঝিন্দরাজ্য। বনহুর এই ঝিন্দরাজ্য এবং জম্বুর এলাকা নিয়ে তার দস্যুতা চালাতো। ঝিন্দের রাণী প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে বনহুর এই ঝিন্দরাজ্যে হানা দেয়নি, তবে তার সতর্ক দৃষ্টি ছিলো ঝিন্দের উপর।

ঝিন্দ রক্ষার দায়িত্বভার জম্বু আস্তানার সর্দার সেলিম খাঁ গ্রহণ করার পর থেকে বনহুর কতকটা আশ্বস্ত ছিলো।

হঠাৎ জংলীদের আক্রমণ সংবাদে বনহুর বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। মুহূর্ত বিলম্ব করতে সে চায়নি। ভুলে গেছে কান্দাইয়ের সেই অদ্ভুত নরহত্যার কথা।

বনজঙ্গল প্রান্তর পেরিয়ে বনহুর আর রহমান এগিয়ে চলেছে।

বেলা প্রায় শেষ হয়ে আসছে।

সূর্যের আলো ক্রমেই নিস্প্রভ মনে হচ্ছে। একটা বড় গাছ দেখে বনহুর তাজকে থামিয়ে সোজা হয়ে বসলো।

রহমানও তার দুলকীর লাগাম টেনে থামিয়ে ফেললো।

বনহুর বললো—রহমান, সন্ধ্যার পূর্বে জম্বু আস্তানায় পৌছানো কিছুতেই সম্ভব নয়।

হাঁ সর্দার, আমিও তাই মনে করছিলাম।

সন্ধ্যার পূর্বে পৌছতে পারলে......

হাঁ, সন্ধ্যার পূর্বে পৌছতে পারলে ভাল হতো।

কিন্তু তা হলো না। রাতের অন্ধকারে জঙ্গলপথ নিরাপদ নয়, তবু আমাদের যেতে হবে, কারণ সেলিম খাঁ বিপদগ্রস্ত জানিয়েছে। জংলীরা জঙ্গলপথ ঘেরাও করে রেখেছে নিশ্চয়ই......

সেটা বুঝতে পারছি, কিন্তু......

সর্দার, আজ রাতটা না নয়......

তা হয় না রহমান, যেমন করে হোক জম্বু আস্তানায় পৌছতে হবেই। আমার মনে হচ্ছে ওরা রাতের অন্ধকারে আক্রমণ চালাবে। আর বিলম্ব করা সমীচীন মনে করছি না।

সর্দার!

জানি বিপদ আছে। বিপদের সঙ্গে পাল্লা দিতেই তো যাচ্ছি।

চলুন সর্দার।

আবার চলতে শুরু করলো ওরা।

অস্তগামী সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে রক্ত ছড়াচ্ছে। মাথার উপরে সীমাহীন আকাশ। অজানা পাখিগুলো ফিরে চলেছে নিজ নিজ বাসায়।

বনহুরের সুন্দর মুখমন্ডলে বেলাশেষের আলোকরশ্মি অদ্ভুত এক ভাবের সৃষ্টি করেছে। কঠিন এক শপথের চিহ্ন ফুটে উঠেছে তার চোখ দু'টিতে।

জম্বু জঙ্গলের নিকটবর্তী হতেই নজরে পড়লো অসংখ্য মশালের আলো। বনহুর আর রহমান তাদের অশ্বের বলগা টেনে ধরে অশ্ব থামিয়ে ফেললো।

রহমান বললো—সর্দার, দেখছেন জংলীরা কেমন সতর্কতার সঙ্গে সজাগ রয়েছে।

হাঁ, তাইতো দেখছি।

নিশ্চয়ই ওরা আমাদের অশ্বপদশব্দ শুনতে পেরেছে।

ঐ দেখো রহমান, মশালের আলোগুলো যেন একত্রিত হচ্ছে।

হাঁ সর্দার, ওরা একত্রিত হচ্ছে এবং আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়াচ্ছে।

জংলীরা বুঝতে পেরেছে কেউ তাদের উপর আক্রমণ চালাতে আসছে। আলোগুলো দ্রুত এক জায়গায় সরে আসছে।

গহন জঙ্গলের মধ্যে পাশাপাশি দু'টি অশ্বপৃষ্ঠে বনহুর আর রহমান। ওরা লক্ষ্য করছে জংলীরা কি করে। অন্ধকারে বনহুরের চোখ দুটো যেন তিহিংসার আগুনে জ্বলছে। জংলীরা শুধু এবার নয়, কয়েকবার জম্বু আস্তানায় আক্রমণ চালিয়ে বহু ক্ষতি সাধন করেছে। একবার দু'জন অনুচরকে ওরা ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছিলো। বনহুর লড়াই করে কয়েকজন জংলীকে হত্যা করেছিলো। তবু তার মনের রাগ মেটেনি। তার যে দু'জন অনুচরকে জংলীরা ধরে নিয়ে গিয়েছিলো, তারা বনহুরের খুব বিশ্বস্ত অনুচর ছিলো। বনহুর তার প্রতিটি অনুচরকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসে! এ কারণেই তার অনুচরগণও তাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। জীবন দিয়েও তার আদেশ পালনে দ্বিধা করে না।

আজ আবার যখন বনহুর শুনলো তার জম্বু আস্তানায় জংলীরা হানা দিয়েছে তখন তার ধমনির রক্তে আগুন ধরে গিয়েছিলো। ঐ দন্ডে সে প্রস্তুতি নিয়ে রওয়ানা দিয়েছে জংলীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে।

বনহুর অল্প সময়ে ভেবে নিলো এখন তার কি করতে হবে। বললো বনহুর—রহমান, বিলম্ব করোনা, জংলীরা এদিকেই আসছে বলে মনে হয়।

হাঁ, তাই মনে হচ্ছে। ঐ দেখুন সর্দার আলোগুলো একত্রিত হয়ে এদিকে ছুটে আসছে।

হাঁ, তুমি বিলম্ব করোনা, শীঘ্র দুলকীসহ কোনো ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ো। সুযোগ বুঝে গুলী ছুড়বে। আমি নিজেও দক্ষিণ দিকের ঝোপের মধ্যে রইলাম।

রহমান বনহুরের আদেশমত উত্তর দিকের জঙ্গলের মধ্যে একটা বড় ঝোপের আড়ালে চলে গেলো।

বনহুর তারপর তাজকে নিয়ে আড়ালে চলে যায়।

ওদিকে অসংখ্য মশাল তীরবেগে ছুটে আসছে বনজঙ্গল ভেদ করে, যেন এগিয়ে আসছে অসংখ্য তারার মালা।

বনহুর আর রহমান রুদ্রমূর্তি নিয়ে প্রতীক্ষা করছে, রাইফেল বাগিয়ে ধরে আছে তারা।

অসংখ্য মশালের আলো তীরবেগে ছুটে আসছে।

মাঝে মাঝে জংলীদের কণ্ঠে অদ্ভুত শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিছু সময়ের মধ্যেই মশালগুলো অতি নিকটে এসে পড়লো, বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে দেখলো বনহুর অগণিত জংলী মশাল হাতে এগিয়ে আসছে। তাদের মধ্যে হাত-পা বাধা অবস্থায় তার জম্বু আস্তানার সর্দার সেলিম খাঁ। শরীরে তার আঘাতের চিহ্ন। রক্তে রাঙা দেখাচ্ছে তার দেহটা।

বনহুর ইচ্ছা থাকলেও গুলী ছুড়লো না। রহমানও প্রতীক্ষা করছিলো, সর্দারের দিক থেকে সাড়া পেলেই সে গুলী ছুড়বে কিন্তু গুলীর কোনো শব্দ না হওয়ায় রহমানও রাইফেল হাতে চুপ রইলো।

জংলীগণ সেলিম খাঁকে নিয়ে মহা হৈ-চৈ করে এগিয়ে চললো।

বনহুর বুঝতে পারলো তারা যা মনে করেছে তাই হয়েছে, তাদের জম্বু আস্তানায় হামলা চালিয়ে জংলীরা সেলিম খাঁ এবং ধনরত্ন সব লুট করে নিয়ে এসেছে। বেশ কিছু সংখ্যক জংলীর কাঁধে বিরাট বিরাট পুটলি লক্ষ্য করলো সে। ঐ সব পুঁটলির মধ্যে যে তাদের জম্বু আস্তানারই ধনসম্পদ আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আরও কয়েকজন অনুচরকেও হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় কাঁধে করে বয়ে আনতে দেখলো সে।

রহমান নিশ্চুপ রয়েছে, কি করবে সে ভেবে পাচ্ছে না। সর্দার কোনো গুলী ছোড়েনি বলে সেও গুলী ছোড়া থেকে ক্ষান্ত রয়েছে। অসীম ধৈর্য সহকারে ঝোপের আড়াল থেকে লক্ষ্য করছে সবকিছু।

জংলীরা মহা আনন্দে চলে গেলো।

ওরা চলে যাবার পর আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো বনহুর, রহমানও বেরিয়ে এলো।

বনহুর বললো—রহমান, গুলী না ছুড়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেছো।

সর্দার, আমি আপনার গুলীর প্রতীক্ষায় ছিলাম, বুঝতে পারলাম আপনি গুলী ছোড়েননি, কাজেই এ ক্ষেত্রে গুলী ছোড়া সমীচীন হবে না।

হাঁ, ঠিক করেছো রহমান, কারণ যা হবার তা হয়ে গেছে। জম্বু আস্তানা ওরা দখল করে, সেমিল খাঁ এবং অন্য অনুচরদের আটক করে ফেলেছে। ধনরত্ন সব লুটে নিয়ে এসেছে।

সর্দার, এখন আমাদের কি কর্তব্য বলে দিন?

এ মুহূর্তে ওদের উপর আক্রমণ চালালে ওরা সেলিম খাঁ এবং অন্যদের হত্যা করে ফেলতে পারে, কাজেই ধৈর্য সহকারে ওদের অনুসরণ করো।

ওরা সংখ্যায় অনেক সর্দার।

হোক তবু আমাদের যুদ্ধ করতে হবে—কিন্তু সুযোগ বুঝে— হঠাৎ নয়। এতে হয়তো হিতে বিপরীত হতে পারে। তারপর বনহুর আপন মনেই বলে—ভেবেছিলাম জম্বু আস্তানা ওরা দখল করার পূর্বেই এসে যাবো তা হলো না। এখন অশ্বের গতি কমিয়ে অতি সাবধানে মশালের আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে চলো।

বনহুর অন্ধকারে অগ্রসর হলো।

রহমান তাকে অনুসরণ করলো।

গহন বন।

চারদিকে জমাট অন্ধকার।

সাধারণ চোখে নিজের শরীরটাও বুঝি নজরে পড়ছে না। বনহুর আর রহমানের চোখ ছিলো বাঘের চোখের মত তীব্র। ছোটবেলা হতেই অন্ধকারে বনজঙ্গলে তাদের কারবার, কাজেই এ অন্ধকার তাদের পথে কোনো অসুবিধা করতে পারলো না।

তাজ এবং দুলকীও প্রভুর মনোভাব বুঝতে পেরেছে, তারাও ঠিকমত কাজ করে চললো।

দূরে মশালের আলো এগিয়ে যাচ্ছে।

জংলীরা আনন্দধ্বনি করছে আর এগুচ্ছে। ওরা ভাবতেও পারেনি তাদের পিছনে যমদূতের মত দু'জন লোক মৃত্যুবাণ হাতে এগিয়ে আসছে।

তাজ এবং দুলকী ধীরে ধীরে চললেও তাদের চলার গতি জংলীদের চেয়ে কম ছিলো না। বেশ সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে ওরা।

হঠাৎ মনে হলো মশালের আলোগুলো যেন থেমে পড়েছে। আলোগুলো ধীরে ধীরে এক জায়গায় গোল হয়ে চক্রাকারের মত স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

বনহুর তার অশ্ব থামিয়ে ফেলতেই রহমান দুলকীর লাগাম টেনে তাকে থামিয়ে বনহুরের অশ্বের পাশে এসে দাঁড়ালো।

বনহুর বললো—ওরা ঐ খানেই আজ রাতের মত আশ্রয় গ্রহণ করবে বলে মনে হচ্ছে।

হাঁ সর্দার, আমারও তাই মনে হচ্ছে। কারণ এরা মনে করেছে জয় যখন তাদের হয়েছে তখন সব বিপদ কেটে গেছে। এবার ওরা নিশ্চিত মনে বিশ্রাম নেবে।

এই মুহূর্ত আমরা বিফলে যেতে দেবো না রহমান।

চলতে চলতে উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিলো।

গহন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে না, তবু গাছপালার ফাঁকে দু'একটা তারা উঁকিঝুকি মারছিলো। রহমান মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছিলো তারাগুলোকে। মনে হচ্ছিলো ওরা তাকে ভরসা দিচ্ছে, ভয় নেই, তোমরা জয়ী হবে।

কোনো জীবজন্তু আক্রমণ করতে পারে সেজন্যও তাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে।

অল্প পথ কিন্তু বেশ সময় লাগলো তাদের জঙ্গলপথে মশালের আলো লক্ষ্য করে এগুতে। প্রায় মশালের আলোগুলোর কাছাকাছি এসে পড়েছে তারা।

বনহুর আর রহমান এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে জংলীরা কি করছে। ওরা দেখলো, জম্বু আস্তানার সর্দার সেলিম খাঁ ও অন্য বন্দীদেরকে এক একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে মজবুত করে বাঁধছে।

বনহুর বললো—রহমান, এই তো সুযোগ। ওরা বন্দীদের বেঁধে রেখে সরে যাবে বিশ্রাম করতে, ঠিক ঐ মুহূর্তে আমরা আক্রমণ চালাবো। তবে সাবধান! একটা গুলী যেন আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়। অথবা আমাদের কোনো অনুচরের গায়ে গিয়ে না লাগে।

হাঁ সর্দার, এ কথা আমারও মনে হয়েছে। হঠাৎ একটা গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে আমাদের লোক মারা পড়বে। ঐ দেখুন ওরা সেলিম খাঁ ও তার সঙ্গীদের বেঁধে কেমন একপাশে গিয়ে মশালগুলো নিভিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে।

রহমান, মোটেই বিলম্ব করো না। মশাল নিভিয়ে ফেললে ওদের কাবু করা কঠিন হবে। তাছাড়া অন্ধকারে কাউকে লক্ষ্য করা যাবে না। মশাল

হাতে রয়েছে, এই সুযোগে এক একজনকে ধরাশায়ী করতে হবে। কিন্তু সাবধান, ওদের হাতে আছে তীর-ধনুক, ওরাও তীর ছুড়বে। যদি একটা তীর এসে বিদ্ধ হয় তাহলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। এক জায়গায় স্থির হয়ে কখনও গুলী চালাবে না।

আচ্ছা সর্দার, আপনার আদেশমতই কাজ করবো।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের রাইফেল গর্জে উঠলো।

রহমানও মুহূর্ত বিলম্ব না করে গুলী ছুড়লো। জংলীদের দু'জন তীব্র আর্তনাদ করে প্রায় চার পাঁচ হাত লাফিলে উঠলো, তারপর হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়লো।

বনহুরের রাইফেল মুহূর্মুহূ গর্জে উঠতে লাগলো।

রহমানও মশালধারী লক্ষ্য করে গুলী ছুড়ে চলেছে। একটা গুলীও ওদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে না।

মশাল হাতে এক একজন জংলী ধরাশায়ী হতে লাগলো। কেউ তীর ছোড়ার সুযোগ পেলো না। ওদের হাতে মশাল থাকায় সুবিধা হলো। ওরা মশাল নিভিয়ে ফেলার বুদ্ধি পেলো না। যদি মশাল নিভিয়ে ফেলতো তাহলে হয়তো দু'চারজন অন্ধকারে আত্মগোপন করে বাঁচতে পারতো।

জংলীরা সংখ্যায় প্রচুর হলেও তারা কেউ প্রাণে বাঁচলো না, কারণ তাদের হাতের মশালের আলোই হলো তাদের কাল।

প্রায় ঘন্টা দুই অবিরত গুলী চালানোর পর সবগুলো জংলীকে নিহত করতে সক্ষম হলো বনহুর আর রহমান।

জংলীদের হাতের মশালের আলোগুলো মাটিতে ছিটকে পড়েও কতগুলো নিভে যায়নি। বনহুর আর রহমান অশ্ব নিয়ে এবার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো। নেমে পড়লো, তারপর এগিয়ে গেলো ধীরে ধীরে।

চারদিকে অসংখ্য জংলীর রক্তাক্ত দেহ ছড়িয়ে পড়ে আছে। বনহুর একটা জ্বলন্ত মশাল তুলে নিলো হাতে। ঘুরেফিরে দেখতে লাগলো।

বনহুর আর রহমানকে দেখে মৃতপ্রায় সেলিম খাঁ এবং তার সঙ্গীরা আনন্দে চীৎকার করে উঠলো। সেলিম খান ও তার সঙ্গীরা পূর্বেই বুঝতে পেরেছিলো নিশ্চয়ই তাদের সর্দার বনহুর এসে গেছে, তারই গুলীতে জংলীদের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে।

বনহুর আর রহমান এগিয়ে গিয়ে তার অনুচরদের বাঁধন খুলে দিতে লাগলো।

কোনো অসুবিধা হলো না, কারণ মশালের আলোতে সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো।

অদূরে এক জায়গায় জম্বু আস্তানা থেকে নিয়ে আসা ধনসম্পদের পুটলিগুলো রাখা হয়েছিলো। জম্বু আস্তানার অনুচরগণ এবার পুটলিগুলো তুলে নিলো কাঁধে।

সেলিম খাঁ জড়িয়ে ধরলো বনহুরকে—সর্দার! কৃতজ্ঞতায় কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে এলো। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বললো—আপনি ঠিক সময় না এসে পড়লে আমাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত ছিলো।

আমি ঠিক সময় পৌঁছেও তোমাদের রক্ষা করতে পারতাম না যদি জংলীরা বুদ্ধিমান হতো। যাক, সবই তোমাদের ভাগ্য। এবার চলো রওনা দেওয়া যাক।

বনহুরের আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুচরগণ জম্বু থেকে লুট করে আনা ধনস্পদের পুটলিগুলো কাঁধে তুলে নিয়ে অগ্রসর হলো।

বনহুর তাজের বলগা ধরে হেঁটে চললো, মাঝখানে সেলিম খাঁ, অপর পাশে দুলকীর লাগাম ধরে রহমান।

পিছনে পিছনে চললো পুটলি কাঁধে অনুচরগণ।

এত সহজে জম্বু আস্তানার বিপদ মুক্ত হবে ভাবতে পারেনি তারা। এমন কি বনহুরও এমনভাবে জয়ী হবে আশা করেনি। ভেবেছিলো জংলীদের সঙ্গে তাকে চরমভাবে বোঝাপড়া করতে হবে।

এ পরম বিজয় সবাইকে আনন্দে আত্মহারা করে তুললো।

❑

বনহুর আর রহমান ভালভাবে কান্দাই আস্তানায় ফিরে আসায় বনহুরের অনুচরদের মধ্যে খুশীর বন্যা বয়ে গেলো। নূরী আর নাসরিনের আনন্দের সীমা নেই।

জয়মালা ওরা পরিয়ে দিলো সর্দার ও তার সহচরের গলায়।

কিন্তু বেশিক্ষণ নূরী বা তার অনুচরগণ বনহুরকে আটকে রাখতে পারলো না। যতক্ষণ কান্দাই শহরের সেই রহস্যময় হত্যাকান্ডের রহস্য উদঘাটন না হয়েছে ততক্ষণ তার শান্তি নেই।

আগামী অমাবস্যার জন্য প্রতীক্ষা করে বনহুর।

তার অনুচরদের ছড়িয়ে দিয়েছে সমস্ত কান্দাই শহরের আনাচে কানাচে। কেউবা ফেরিওয়ালা, কেউবা ড্রাইভার, কেউবা কুলি-মজুর, কেউবা ঝাড়ুদার হিসেবে অনুসন্ধান করে ফিরে কোথায় এবং কে এই হত্যা রহস্যের নায়ক।

বনহুর রাতের অন্ধকারে অনুসন্ধান করে চলেছে। কোনোদিন তাজের পিঠে, কোনোদিন গাড়ি নিয়ে, কোনোদিন পদব্রজে।

কিন্তু নিরাশ হয়ে পড়েছে, পরপর আরও দুটো হত্যাকান্ড ঘটে গেলো কান্দাই শহরে।

পুলিশমহলের ধারণা দস্যু বনহুর নতুন এক হত্যাকান্ডে মেতে উঠেছে। তাই তাকে পাকড়াও করার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করছে তারা। মিঃ জাফরী আরও কয়েকজন জাদরে পুলিশ অফিসার সহ কান্দাই এসে পৌঁছেছেন।

গভীরভাবে এ ব্যাপার নিয়ে তাঁরা আলোচনা চালিয়ে চলেছেন। সমস্ত শহরময় একটা চঞ্চলতা বিরাজ করছে।

আগামীকাল আবার অমাবস্যা।

না জানি শহরের কোন্ ব্যক্তি মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করছে।

মিঃ জাফরী তাঁর কয়েকজন দক্ষ পুলিশ গোয়েন্দা নিয়ে এক গোপন স্থানে কথাবার্তা বলছিলেন—কাল অমাবস্যা রাতে তাঁরা কিভাবে কাজ করবেন, এটাই ছিলো তাঁদের আলোচনার বিষয়।

মিঃ জাফরী গম্ভীরভাবে সোফায় হেলান দিয়ে বসে সিগারেট পান করছিলেন আর মাঝে মাঝে কথাবার্তা বলছিলেন।

মিঃ ফেরদৌস এবং মিঃ হারেস ও প্রখ্যাত গোয়েন্দা শঙ্কর রাও আজ উপস্থিত আছেন এ আলোচনা সভায়।

শঙ্কর রাও একবার বনহুরের কাছে নাকানি চুবানি খেয়েছিলেন, তাই তাঁর রাগ যেমন করে হোক বনহুরকে শায়েস্তা করা। কিন্তু বহুদিন চেষ্টা করেও বনহুরকে শায়েস্তা করা তাঁর হয়ে ওঠেনি।

আজ যখন সেই বনহুরকে নিয়ে আবার পুলিশমহলে সাড়া পড়ে গেছে তখন শঙ্কর রাওয়ের মনটা খুশীতে ভরে উঠেছে, কারণ অনেক দিন পর আবার তিনি বনহুর গ্রেপ্তারে আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হলেন।

আলোচনা চলছে। এবার কথা বললেন শঙ্কর রাও—এ হত্যাকান্ড কেন যে করছে তার প্রমাণ কিছু পাওয়া গেছে কি?

শঙ্কর রাওয়ের কথায় ডাক্তার জবাব দিলেন—উদ্দেশ্যবিহীন কেউ কোনো কাজ করে না কোনোদিন, বুঝলেন মিঃ রাও?

আপনি কি মনে করেন ডাক্তার রায়? বললেন মিঃ জাফরী।

একটু ভেবে নিয়ে বললেন ডাক্তার রায়—আমার মনে হয় দস্যু বনহুর নতুন এক অভিযানে আত্মনিয়োগ করেছে।

ভ্রুকুঞ্চিত করে বললেন মিঃ হারেস—অভিযান মানে?

মানে নতুন কোনো......

ডাক্তার রায়ের কথার মাঝখানে হেসে বললেন মিঃ ফেরদৌস—সে নতুন কোনো অভিযান শুরু করেছে।

হাঁ, মিথ্যা নয় মিঃ ফেরদৌস।

মিঃ ফেরদৌস পুনরায় বলে উঠলেন—আপনি কি মনে করেন এটা দস্যু বনহুরেরই কাজ?

নিশ্চয়ই এটা স্বয়ং দস্যু বনহুরের কাজ। কারণ ইন্সপেক্টার মিঃ ইলিয়াস নিজে বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে সেদিন সক্ষম না হলেও তাকে তিনি ভালভাবে দেখেছিলেন। কথাগুলো বলে ডাক্তার রায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেললেন মিঃ ফেরদৌসের মুখে।

মিঃ জাফরী বললেন—হাঁ, ডাক্তার রায় যা বললেন ঠিক, কারণ আমি হিন্দল থেকে কান্দাই পৌঁছেই ইন্সপেক্টার মিঃ ইলিয়াস ও তাঁর সঙ্গীদের যারা সেদিন ঐ মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে যা জানতে পেরেছি তাতে এ হত্যাকান্ড স্বয়ং দস্যু বনহুর দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে।

মিঃ ফেরদৌস বললেন—এমনও তো হতে পারে সেই আর্তনাদের শব্দ শুনে মিঃ ইলিয়াস তাঁর দলবল নিয়ে যেমন ছুটে হাজির হয়েছিলেন তেমনি দস্যু বনহুরও হয়তো বা ছুটে এসেছিলো?

হো হো করে হেসে উঠলেন মিঃ জাফরী, তারপর হাতের অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা এ্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে সোজা হয়ে বসে বললেন—দস্যু বনহুরের প্রতি আপনার বিশ্বাস দেখে আমি না হেসে পারলাম না মিঃ ফেরদৌস।

এবার শঙ্কর রাও বলে উঠলেন—মিঃ ফেরদৌস নতুন গোয়েন্দা অফিসার, তিনি দস্যু বনহুর সম্বন্ধে এমন মতামত পেশ করবেন, তাতে হাসবার কিছু নেই স্যার।

তা অবশ্য ঠিক, যিনি দস্যু বনহুরের সঙ্গে মোকাবেলা না করেছেন, তিনি তার সম্বন্ধে কোন ধারণাই করতে পারবেন না। মিঃ ফেরদৌস, আপনি দক্ষ গোয়েন্দা হতে পারেন কিন্তু......

মিঃ জাফরীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলেন মিঃ ফেরদৌস—দস্যু বনহুরের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এইতো বলতে চাচ্ছেন স্যার?

হ্যাঁ। আপনি কিছুদিন আমাদের সঙ্গে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার ব্যাপারে সহায়তা করুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন দস্যু বনহুর কি জিনিস!

সত্যি স্যার, এ ক'দিনেই আমি যেন বেশ ঘাবড়ে উঠেছি। পুলিশমহল এত সতর্কতার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন তবু দস্যু বনহুর তার কাজ ঠিকভাবেই করে চলেছে। হত্যারহস্য উদঘাটন তো দূরের কথা, হত্যাকান্ডের এতটুকু সূত্র পুলিশ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি বা হলো না।

আপনার কথা মিথ্যা নয় মিঃ ফেরদৌস, কারণ আপনি যা বললেন সম্পূর্ণ সত্য। পুলিশমহল তো কিছুই সূত্র আবিষ্কারে সক্ষম হয়নি। আমি এতগুলো লাশ পোষ্টমর্টেম করেও তেমন কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারিনি। কেন বা কি জন্য দস্যু বনহুর এ হত্যারহস্য চালিয়ে চলেছে তা এখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রয়েছে। কথাগুলো বলে থামলেন ডাঃ রায়।

মিঃ জাফরী কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলেন মিঃ হারুন, তাঁর চোখেমুখে হতাশা আর ক্লান্তির ছাপ। তাঁর সঙ্গে আরও দু'জন তরুণ পুলিশ অফিসার সেই কক্ষে প্রবেশ করলেন।

মিঃ হারুন ধপ্ করে বসে পড়লো একটা চেয়ারে। তাঁর সঙ্গীদ্বয় ক্লান্তভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন যেন রণক্লান্ত সৈনিক।

মিঃ জাফরী বললেন—আজও ব্যর্থ হলেন মিঃ হারুন?

হাঁ স্যার, কয়েকদিন একটানা পাহারা দিয়েও দস্যু বনহুরের টিকিটিও দেখতে পেলাম না।

একেবারে নিরাশ হয়ে পড়েছেন দেখছি মিঃ হারুন? দস্যু বনহুর গ্রেপ্তারে অসীম ধৈর্যের দরকার। এত সহজে হতাশ হলে চলবে না। কথাগুলো হাসতে হাসতে বললেন তরুণ গোয়েন্দা মিঃ ফেরদৌস।

মিঃ ফেরদৌসের কথায় বললেন শঙ্কর রাও—অসীম ধৈর্যের কোনো প্রয়োজন হবে না মিঃ ফেরদৌস! এবার আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। কারণ কতদিন সে আর আত্মগোপন করে পালিয়ে থাকবে!

সত্যি, বেচারা দস্যু বনহুরটার জন্য আমার বড্ড মায়া হচ্ছে। বললো মিঃ ফেরদৌস।

মিঃ জাফরী বলে উঠলেন—এবার আপনারা কাজের কথায় আসুন। আগামীকাল অমাবস্যা। খুনী তার কাজ ঠিকভাবেই সমাধা করে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই কাল শহরে রাত দুটোর পর কেউ যেন বাইরে না থাকে এটা প্রচার করে দিতে হবে।

ডাক্তার রায় বললেন—যত সাবধানই আমরা হই না কেন দস্যু বনহুর তার সাধনা চালিয়ে যাবেই......

মিঃ ফেরদৌস তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে তাকালেন ডাক্তার রায়ের মুখের দিকে, বললেন—সাধনা!

হাঁ, সাধনাই বটে।

তাহলে কি দস্যু বনহুর কোনো সাধনা করে চলেছে বলে আপনার মনে হয়?

নিশ্চয়ই, নাহলে সে এমনভাবে নরহত্যায় মেতে উঠতো না।

মিঃ ফেরদৌস এবং ডাঃ রায়ের কথার মাঝখানে বলে উঠেন মিঃ জাফরী— দস্যু বনহুর যেন কাল তার সাধনার বলি খুঁজে না পায় সেজন্য আমাদের সতর্ক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং কাল আমরা কেউ তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হবো বলে আশা করি।

শঙ্কর রাও বললেন—আমার গোয়েন্দা বিভাগ এ ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ রয়েছেন।

মিঃ ফেরদৌস হেসে বললেন—আপনাকে একটু বেশি সজাগ থাকার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি মিঃ রাও, কারণ আপনি পুরোনো গোয়েন্দা কিনা।

মিঃ জাফরী এবার মিঃ হারুনকে লক্ষ্য করে বললেন—এক্ষুণি আপনি রেডিও অফিসে জানিয়ে দিন, কাল রাত দুটোর পর একটা প্রাণীও যেন শহরের পথে ঘোরাফেরা না করে, কারণ দেখা গেছে রাত দু'টার পরই এ হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়।

মিঃ ফেরদৌস বললেন এবার—স্যার, রাত দুটোর পর তো খুনী তার কাজ শেষ করেই গেলো। তখন সাবধান হয়ে কোনো লাভ হবে না, বরং সন্ধ্যার পর থেকে সমস্ত রাত শহরে কার্ফু দিয়ে কড়াকড়ি আইন জারি করে দিলে ভাল হয়।

মিঃ ফেরদৌসের কথায় সবাই সায় দিলেন।

মিঃ জাফরীও সম্মতি জানিয়ে মিঃ হারুনকে এ সংবাদ ঘোষণার জন্য নির্দেশ দিলেন।

সেদিনের মত আলোচনা এ পর্যন্তই শেষ হলো।

পরদিন।

কান্দাই শহরে ঘরে ঘরে আতঙ্ক, আজ কার সন্তান, স্বামী কিংবা ভাই নিহত হবে কে জানে।

রেডিও বারবার ঘোষণা করছে, 'আজ সন্ধ্যার পর থেকে আগামীকাল সকাল পর্যন্ত কান্দাই শহরের সর্বত্র কার্ফু জারি থাকবে।' এ সংবাদ মানুষের মনে আরও ভীতিভাব জাগিয়ে তুলেছে। কেমন একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছে শহরময়।

সন্ধ্যার পূর্বেই সমস্ত দোকানপাট, হোটেল, সিনেমা হল, ক্লাব জনশূন্য হয়ে পড়ে। রাজপথ নির্জন।

দু'একটা যানবাহন দ্রুত এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে।

গাড়ির চালকের মুখে আতঙ্কের ছাপ। সন্ধ্যার আর বাকী নেই। তাড়াতাড়ি তাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে হবে।

কার্ফু চলাকালে ডাক্তার, ফায়ার ব্রিগেড এবং এয়ারপোর্টের গাড়ি চলতে পারে কিন্তু আজকের কার্ফুতে সে সবও নিষেধ। কোনো রকম যানবাহনই চলাচল নিষিদ্ধ।

সন্ধ্যার পর থেকেই কার্ফু জারি হলো।

সমস্ত শহর প্রাণহীন নিস্পন্দ হয়ে পড়লো।

রাজপথের লাইটপোষ্টের আলোকগুলোকে আজ কেমন যেন ভূতুড়ে মনে হচ্ছে। ক্রমেই কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে আসছে কান্দাইয়ের আকাশ।

শীতের রাত।

কোনো এক গীর্জার ঘড়িতে প্রতিধ্বনিত হলো রাত দশটা।

আজ শীতটা যেন আরও বেশি অনুভূত হচ্ছে।

কুয়াশা যত বাড়ছে লাইটপোষ্টের আলোগুলো ততই নিষ্প্রভ হয়ে আসছে।

এতক্ষণ বাড়ির জানালার ফাঁকে ইলেকট্রিক আলোকরশ্মির ঝিলিক দেখা যাচ্ছিলো, এখন তাও নজরে আসছে না।

বাড়িগুলো যেন এক একটা ঘুমন্ত পুরী বলে মনে হচ্ছে—কোনো মায়াবিনী রাক্ষসীর যাদুকাঠির স্পর্শে সব যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিন্তু বাড়িগুলো ঘুমন্ত পুরী বলে মনে হলেও আসলে কোনো বাড়ির লোকজন ঘুমোতে পারেনি। সবাই ঘরে ঘরে কুঁকড়ে বসে আছে। যেন কোনো একটা ভয়ঙ্কর কিছুর জন্য প্রতীক্ষা করছে তারা।

এতটুকু শব্দ হলেই চমকে উঠছে, না জানি কে কোন্ পথে ভিতরে প্রবেশ করলো। ছোট ছোট বাচ্চাগুলোও যেন মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে চুপ করে আছে। যদিও তারা কিছু বুঝতে পারছে না, তবু বড়দের আতঙ্কিত ভাব তাদের কচি মনেও একটা ভীতি ভাবের প্রভাব বিস্তার করেছে।

চৌধুরীবাড়ির একটা ঘরে এমনি আতঙ্কভরা ভার নিয়ে মনিরা আর মরিয়ম বেগম বসে আছেন। নূর বসে আছে মা এবং দাদীমার মাঝখানে। পাশের কক্ষে বৃদ্ধ সরকার সাহেব আর পুরোনা চাকর মকবুল।

অন্য চাকর বাকর, দারোয়ান সবাই নীচের তলায় হলঘরের পাশের ঘরটায় দরজায় খিল এঁটে বসে আছে। কারও চোখে ঘুম নেই।

আজ অমাবস্যা রাত।

সেই রহস্যময় ভয়ঙ্কর রাত।

যে রাতে একটা প্রাণ-প্রদীপ নিভে যায় নৃশংসভাবে, কেউ তা রোধ করতে পারে না।

সমস্ত শহরে যখন গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে তখন দস্যু বনহুর তার তাজকে নিয়ে আস্তানার বাইরে এসে দাঁড়ালো।

রহমান এবং নূরী তার পাশে।

রহমান বললো—সর্দার।

জানি তোমরা ভয় পাচ্ছো।

নূরী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো—সমস্ত শহরে কার্ফু। একটা প্রাণী নেই কোথাও। তুমি যাচ্ছো......

হাসলো বনহুর—ফিরে যদি না আসি এই তো? আমিই যদি সেই রহস্যময় হত্যাযজ্ঞের শিকার হই......

চুপ করো! অমন কথা মুখে এনো না।

তাহলে কেন ভয় পাচ্ছো, বলো?

এবার রহমান বললো—সর্দার, এ যেন যাদুমন্ত্রের মত। এত পাহারা তবু এ হত্যাকান্ড ঘটে চলেছে। কেউ সেই হত্যাকারীর সন্ধান পেলো না।

রহমান, তুমিও অবুঝ হলে! কেউ পেলো না বলেই তো আমার এত ভাবনা। যতক্ষণ আমি এ হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে সক্ষম না হয়েছি

ততক্ষণ আমার স্বস্তি নেই। নূরী, চলি......বনহুর তাজের পিঠে চেপে বসলো।

তাজ এবার সম্মুখের পা দু'খানা উঁচু করে চিঁহি চিঁহি শব্দ করে ছুটতে শুরু করলো।

নূরী আঁচলে মুখ ঢেকে ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো।

রহমান নূরীর কাঁধে হাত রেখে বললো—কেঁদো না নূরী। তোমার স্বামী যেন জয়ী হতে পারে, সেই প্রার্থনা করো।

❑

জমাট অন্ধকার ভেদ করে একটা তীব্র আর্তনাদের শব্দ কান্দাই শহরটাকে যেন কাপিয়ে তুললো। সে কি মর্মস্পর্শী করুণ চীৎকার।

তারপর সব নিস্তব্ধ।

চারদিক সূচীভেদ্য অন্ধকার।

ঘরে ঘরে ভীত আতঙ্কিত লোকজন আঁতকে উঠলো।

আর্তনাদের পর পরই শোনা গেলো অশ্বপদশব্দ খট্ খট্ খট্... দূর হতে আরও দূরে শব্দটা সরে যাচ্ছে।

নূর চাপাকণ্ঠে বলল- আম্মি, ঐ দেখো দস্যু বনহুর তার হত্যালীলা শেষ করে পালিয়ে যাচ্ছে।

মরিয়ম বেগম কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, মনিরা বললো—চুপ করো মামীমা, ওকে বলতে দাও।

নূর মায়ের কথায় কান না দিয়ে বলে আবার—আম্মি, তোমরা বিশ্বাস করো না, আজ প্রমাণ পেলে? ঐ শোনা যাচ্ছে অশ্বপদশব্দ......

মনিরা আনমনা হয়ে যায়, সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে তাজের খুঁড়ের শব্দ। ঐ শব্দ তার যে অতি পরিচিত।

পাশের ঘরে সরকার সাহেব এবং মকবুলও এ শব্দ শুনতে পাচ্ছে, তাদের মনেও সন্দেহের দোলা—তবে কি তাদের মনিবেরই এ কাজ?

আজ ক'দিন থেকে নূর সব সময় বলছে, এ হত্যালীলা দস্যু বনহুর ছাড়া কেউ করতে পারে না। নানাজনের মুখে সে ঐ একই কথা শুনে আসছে। সংবাদপত্রে সেই একই সংবাদ পড়ছে। অবিশ্বাসের কিছু নেই!

এদিকে যখন কান্দাই শহরের প্রতিটি ঘরে মহা আতঙ্ক বিরাজ করছে, তখন কান্দাইয়ের দক্ষিণ প্রান্তরে এক অদ্ভুত মানুষ একটা শব্দহীন গাড়ি চালিয়ে তীরবেগে পালিয়ে যাচ্ছে।

পিছনে ছুটছে তাজের পিঠে স্বয়ং দস্যু বনহুর। গাড়িখানাকে অনুসরণ করে এগুচ্ছে তাজ। বনহুরের দক্ষিণ হাতে রিভলভার, বাম হাতের মুঠায় তাজের লাগাম।

গাড়িখানা যখন লাইটপোষ্টের নীচে দিয়ে উল্কাবেগে চলে যাচ্ছিলো, তখন বনহুর লক্ষ্য করছে গাড়ির চালকের হাত দু'খানা স্বাভাবিক মানুষের হাত নয়। যদিও চালকের শরীরখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো না, তবুও বুঝা যাচ্ছিলো শরীরে তার লোম আছে।

বনহুর তাজকে দ্রুত চালনা করেও কিছুতেই গাড়িখানাকে রিভলভারের গুলীর আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারছে না। পথ ছেড়ে প্রান্তর, তারপর উঁচুনীচু পাহাড়িয়া পথ।

বনহুর অবাক না হয়ে পারছে না, কারণ এ ধরনের গাড়ি সে এর পূর্বে কোনোদিন দেখেনি। তা ছাড়া এমন চালকও সে দেখেনি কোনোদিন। নিজেও সে দক্ষ ড্রাইভার কিন্তু একি, একটা জন্তু গাড়ী চালাচ্ছে, এমনও তার বুদ্ধি!

শেষ পর্যন্ত তাজকে পরাজয় বরণ করতে হলো, কারণ গাড়িখানা হাওয়ার বেগে দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলো।

অন্ধকার রাত না হলে বনহুর গাড়ির চাকার দাগ লক্ষ্য করে গাড়িখানাকে অনুসরণ করতে পারতো। কিংবা শব্দহীন গাড়ি না হলে শব্দ লক্ষ্য করে এগুতে পারতো। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো আজ তার।

ভোর হবার পূর্বে ফিরে এলো বনহুর তার আস্তানায়। অশ্বপদ শব্দ শোনামাত্র রহমান তার দলবল নিয়ে এগিয়ে এলো আস্তানার বাইরে।

নূরী, নাসরিন, বৃদ্ধা দাইমা পর্যন্ত আজ বেরিয়ে এলো তাজের খুঁড়ের শব্দ শুনে।

বনহুর তাজের পিঠ থেকে নামতেই দু'জন অনুচর তাজের লাগাম ধরে ফেললো।

বনহুর এগুতে লাগলো, চোখেমুখে তার ক্লান্তির ছাপ।

কেউ কোনো প্রশ্ন করার সাহসী হলো না। সবাই বনহুরকে অনুসরণ করে আস্তানার ভিতরে এগিয়ে চললো।

বনহুর বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ না করে দরবার কক্ষের দিকে চললো। দরবারকক্ষে তার আসনের পাশে গিয়ে একটা পাথরখন্ডে ধপ্ করে বসে পড়ে বললো—পারলাম না হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করতে।

রহমান এবং নূরী ছাড়া অন্য কেউ দরবারকক্ষে প্রবেশ করেনি। বনহুরের একপাশে রহমান অপর পাশে নূরী দাঁড়িয়ে ছিলো। উভয়েরই চোখেমুখে উদ্বিগ্নতা। বনহুরের কথায় রহমান এবং নূরীর মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো।

বনহুর বললো—আশ্চর্য লোমশদেহী একটা জন্তু এই হত্যা রহস্যের নায়ক।

লোমশদেহী! দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে বলে উঠলো নূরী।

হাঁ, শুধু তাই নয়, সেই লোমশদেহী জীবটা দক্ষ ড্রাইভার। তাজকে সে পরাজিত করেছে।

রহমান এবং নূরী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে শুনছে।

বনহুর গতরাতের ঘটনাটা সব খুলে বললো। সে যেন এক বিস্ময়। কাল আমি যখন চৌধুরীবাড়ির সম্মুখে এসে পৌঁছেছি, ঠিক ঐ মুহূর্তে একটা আর্তচীৎকার, সঙ্গে সঙ্গে আমি চীৎকার লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলাম। চারদিকে জমাট অন্ধকার, দেখলাম একটা গাড়ি তীরবেগে চলে যাচ্ছে। গাড়িখানা চলাকালে এতটুকু শব্দ হচ্ছে না। যদিও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো না কিছু, তবুও আমি সেই গাড়িখানাকে লক্ষ্য করে তাজকে চালাতে লাগলাম। যখন গাড়ীটা রাজপথ ধরে উল্কাবেগে ছুটছিলো তখন মাঝে মাঝে লাইটপোষ্টের আলো গাড়ির ভিতর প্রবেশ করছিলো। অস্পষ্ট দেখলাম দু'টি লোমশ বাহু গাড়ির হ্যান্ডেল চেপে ধরে আছে। দেহের কিছু অংশও নজরে পড়লো, আমার মনে হলো ওর দেহটাও লোমে ভরা।

রহমান বললো—নিশ্চয়ই ওটা দক্ষ গরিলা জাতীয় জীব হবে।

একটু ভেবে বললো বনহুর—কিন্তু গরিলার এত নিপুণতার সঙ্গে গাড়ি চালানোটা কেমন যেন সন্দেহজনক। আমি দেখতে চাই সত্যিই সে গরিলা বা বনমানুষ কিনা। আর জানতে চাই কি উদ্দেশ্যে সে এমন হত্যালীলা চালিয়ে চলেছে।

এখানে বনহুর যখন রহমান আর নূরীর সঙ্গে রাতের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছিলো, তখন কান্দাই পুলিশ অফিসের বারান্দায় গত রাতের লাশটা এনে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা যুবকের মৃতদেহ। বুকের ক্ষতটা

ছাড়া মৃতদেহের শরীরে আর কোনো ক্ষত চিহ্ন নেই। এমন কি মৃতদেহের চোখ দুটো আজ উপড়ে তুলে নেওয়া হয়নি।

লাশটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন কয়েকজন জাঁদরেল পুলিশ অফিসার—মিঃ জাফরী, মিঃ ইলিয়াস, মিঃ শঙ্কর রাও এবং মিঃ হারুন ও কয়েকজন পুলিশ ইন্সপেক্টার। ডা ঃ রায়কে ফোন করা হয়েছে। তিনি এখনও ঘুম থেকে উঠেননি বলে তাঁর বাসা থেকে জানিয়েছে। মিঃ ফেরদৌসও এখনও এসে পৌঁছেননি।

মিঃ ফেরদৌস এবং ডাঃ রায়ের জন্য সবাই অপেক্ষা করছেন। লাশটা ডাঃ রায় পরীক্ষা করার পর মর্গে পাঠানো হবে।

মৃতদেহটা কোনো ভদ্র যুবকের তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হাতঘড়িটা হাতে এখনও টিক্ টিক্ করে চলছে। দেহে মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদ। চোখেমুখে আভিজাত্যের ছাপ।

মিঃ জাফরী বেশে কিছুক্ষণ মৃত যুবকের মুখে লক্ষ্য করে বললেন—গতকাল সন্ধ্যার পর থেকে সমস্ত কান্দাই শহরে কার্ফু জারি থাকাকালেও এ যুবক কি করে পথে বেরিয়েছিলো?

স্যার, এ প্রশ্নই আমাদের সকলকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে, বললেন মিঃ হারুন।

মিঃ ইলিয়াস বললেন—আমার মনে হয় একে তার বাসা থেকে ধরে এনে পথের মাঝে হত্যা করা হয়েছে।

মিঃ রাও বললেন—একে পথের মাঝে ধরে এনে হত্যা করেছে, এটা আপনি কি করে বুঝলেন মিঃ ইলিয়াস?

আমি নিজে গিয়েছিলাম সেখানে যেখানে লাশটা পড়েছিলো। আমি জায়গাটা লক্ষ্য করে বুঝতে পারি যুবকটাকে সেই স্থানেই হত্যা করা হয়েছে, কারণ তখনও পথের বুকে চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে আছে। বলে থামলেন মিঃ ইলিয়াস। একটু থেমে পুনরায় বললেন—জানি না আপনারা লক্ষ্য করেছেন কিনা রক্তের পাশ কেটে একটা গাড়ির চাকা চলে গেছে।

আপনি কি করে বুঝলেন এই যুবকটা নিহত হবার পরই সেই গাড়ির চাকার দাগ পড়েছে? বললেন মিঃ জাফরী।

মিঃ ইলিয়াস বললেন—আপনারা লক্ষ্য না করলেও আমি লক্ষ্য করেছি গাড়ির চাকাটা ঠিক রক্তের পাশ কেটে যাবার সময় রাস্তায় টায়ারের দাগ পড়েছে।

এমন সময় ডাঃ রায় প্রবেশ করলেন সেখানে, তিনি মিঃ ইলিয়াসের কথাট শুনতে পেয়েছিলেন,. বললেন—আমি এক্ষুণি সেই স্থান থেকে আসছি। করাণ লাশ পরীক্ষা করার পূর্বে যেখানে হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে, ঐ স্থান আমি পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন মনে করেছিলাম। সেজন্য আমি সেখানে যাই। যদিও আমি ঘুম থেকে উঠে জানতে পারি আপনারা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি সেস্থান ভালভাবে পরীক্ষা করে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যা আমাকে এ হত্যারহস্য ব্যাপারে অনেকখানি অগ্রসর হতে সাহায্য করেছে।

উপস্থিত সবাই ডাঃ রায়ের মুখে প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, কি বলতে চান তিনি।

ডাঃ রায় বলে চলেন—আমি চাপ চাপ রক্তের পাশে স্পষ্ট অশ্ব-পদচিহ্ন লক্ষ্য করেছি।

একসঙ্গে সকলেই মৃদু গুঞ্জনধ্বনি করে উঠলেন।

শঙ্কর রাও বলে উঠলেন—আমি পূর্বেই বলেছি এটা দস্যু বনহুরের কাজ।

ডাঃ রায় বললেন—আমি সঠিকভাবে বলতে চাই না যে, এটা দস্যু বনহুরেরই কাজ, কারণ মিঃ ইলিয়াস বললেন তিনি পথের বুকে গাড়ির টায়ারের ছাপে রক্তের চিহ্ন লক্ষ্য করেছেন।

মিঃ জাফরী বললেন—সূত্র পাওয়া যাচ্ছে অনেক কিন্তু হত্যার রহস্য কি তা আজও জানা যাচ্ছে না। ডাঃ রায়, আপনি লাশটা পরীক্ষা করে দেখুন। আজকের লাশ থেকে চোখ দুটো উপড়ে নেওয়া হয়নি।

ডাঃ রায় বিস্ময়ভরা চোখে তাকালেন লাশটার দিকে। ঝুঁকে পড়ে দেখলেন কিছুক্ষণ, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন—আজ খুনী তার কাজ শেষ করতে পারেনি, কারণ চোখ দুটোই ছিলো তার প্রয়োজন।

হাঁ, আমারও তাই মনে হয় ডাঃ রায়। বললেন মিঃ জাফরী।

শঙ্কর রাও বলে উঠলেন—দস্যু বনহুর এবার অর্থের মোহ ত্যাগ করে চোখের মোহে মেতে উঠেছে দেখছি।

আশ্চর্য বটে! বললেন মিঃ হারুন।

ডাঃ রায় লাশ পরীক্ষা শেষ করে লাশটাকে মর্গে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

এবার সবাই অফিসরুমে প্রবেশ করলেন।

অফিসকক্ষে বসে মিঃ জাফরী সেদিনের লাশটা সম্বন্ধে তাঁর ডায়রীর খাতায় খসখস করে কিছুক্ষণ লিখলেন। ততক্ষণ অন্যান্য অফিসার চাপাস্বরে নানা রকম আলাপ-আলোচনা করছিলেন।

লেখা শেষ করে মিঃ জাফরী বললেন—কার্ফু যখন ব্যর্থ গেলো তখন এ হত্যালীলা বন্ধ করা কারও সাধ্য নেই।

হাসালেন ডাঃ রায়—কার্ফু দিয়ে হত্যাকারীর কাজ বন্ধ করা যাবে না মিঃ জাফরী। সাধনা সে এক ভিন্ন জিনিস। যত বাধাই থাকুক সাধক তার সাধনা চালিয়ে যাবেই। তবু সে যা তা বা যে সে মানুষ নয়, স্বয়ং দস্যু বনহুর।

শঙ্কর রাও বলে উঠলেন—একটু পূর্বে আপনি কিন্তু দস্যু বনহুর সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেছিলেন।

এখনও আমি সন্দেহ দোলায় দুলছি......

কারণ? বললেন মিঃ ইলিয়াস।

কারণ দস্যু বনহুর হত্যা করতে পারে কিন্তু চোখ উঠিয়ে নিয়ে সে কি করবে?

শঙ্কর রাও বললেন—দস্যু বনহুর যে খামখেয়ালী সে কথা আপনারা সবাই জানেন। তার ইচ্ছা হলে হত্যা করে, ইচ্ছা হলে বাঁচিয়ে নেয়। ইচ্ছা হলে লুটে নেয়, আবার ইচ্ছা হলে বিলিয়ে দেয়......

আপনি যা বললেন সত্য, দস্যু বনহুর খামখেয়ালী, তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে তার কার্যকলাপ। তাই বলে কেউ সঠিকভাবে বলতে পারে না যে, দস্যু বনহুরই এ হত্যাকান্ডের নায়ক। কথাগুলো বললেন কান্দাই পুলিশ সুপার মিঃ আহমদ আলী। তিনি প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি, এতক্ষণ তিনি চুপচাপ সব কথা শুনে যাচ্ছিলেন।

মিঃ জাফরী বলে উঠলেন—মিঃ আলী, আপনি এ কথা বলতে পারলেন? কারণ আপনারই পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হুসাইন এবং মিঃ কাওসার স্বচক্ষে তাকে দেখেছেন এবং গ্রেপ্তার করতেও গিয়েছিলেন।

সব জানি কিন্তু তাকে হত্যা করতে কেউ দেখেছে বলে তাঁরা বলতে পারেননি। এমনও তো হতে পারে ঐ ব্যক্তি নিহত হবার পর দস্যু বনহুর সেখানে এসে পড়েছে যেমন আমাদের পুলিশ বাহিনী গিয়ে পৌছেন। কথাগুলো বলে থামলেন মিঃ আলী।

মিঃ জাফরী জবাব দিলেন আবার—তা হয় না মিঃ আলী, কারণ পুলিশ রিপোর্টে যেমন জানা গেছে তাতে দস্যু বনহুরই যে এ হত্যাকান্ডের অধিনায়ক তাতে কোনো ভুল নেই।

এমন সময় বাইরে গাড়ি থামার শব্দ হলো।

একটু পরে কক্ষে প্রবেশ করলেন মিঃ ফেরদৌস। মুখমন্ডল গম্ভীর এবং ভাবাপন্ন। কক্ষে প্রবেশ করেই হ্যাট খুলে সবাইকে লক্ষ্য করে অভিবাদন জানালেন।

মিঃ জাফরী বললেন—হ্যালো মিঃ ফেরদৌস, আপনি আজ বড্ড লেট করে ফেলেছেন।

বিলম্বের জন্য আমি দুঃখিত স্যার।

বসুন।

মিঃ ফেরদৌস একটা চেয়ারে বসে পড়ে মাথার হ্যাটটা খুলে রাখলেন সম্মুখের টেবিলে।

মিঃ জাফরী বললেন—লাশটা আজ আপনার দেখা উচিত ছিলো, কারণ অন্যান্য দিনের মত আজ লাশ থেকে চোখ উপড়ে নেওয়া হয়নি।

লাশ কি মর্গে পাঠানো হয়েছে?

হাঁ।

আমি সেখানেই গিয়ে দেখে আসবো।

তাই দেখে আসুন, তাহলে আজকের হত্যা ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা বাড়বে।

মিঃ ফেরদৌস উঠে পড়লেন এবং সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

মিঃ ফেরদৌস বেরিয়ে যেতেই মিঃ হারুন বলে উঠলেন—স্যার, মিঃ ফেরদৌসের কাজকর্ম, চলাফেরা কেমন যেন সন্দেহজনক বলে আমার মনে হয়।

একটু হেসে বললেন ডাঃ রায়—ভদ্রলোক অতি বুদ্ধিমান এবং কাজের লোক। তাঁর চালচলনে সন্দেহের কিছু থাকলেও তা তাঁর কাজের জন্যই পরিলক্ষিত হয়। আমি তাঁকে সমীহ করি।

মিঃ জাফরীও সায় দিলেন ডাঃ রায়ের কথায়।

❑

ডাঃ রায় তাঁর ল্যাবরেটরীতে প্রবেশ করতেই তাঁর দৃষ্টি পড়লো ল্যাবরেটরী ব্যালকনীতে কেউ পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত শরীর তার

আলখেল্লায় ঢাকা, মাথায় সামনের দিকে ঝুকানো ফেল্ট ক্যাপ। আলখেল্লাধারী নিশ্চয় সিগারেট পান করছে, কারণ একরাশ ধোয়ার কুন্ডলি তার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

ডাঃ রায়ের ভ্রু কুঞ্চিত হলো, তিনি ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন।

কিন্তু বেশিদূর এগুতে হলো না ডাঃ রায়কে।

আলখেল্লাধারী ফিরে তাকালো।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন ডাঃ রায়—কে?

আলখেল্লাধারীর মুখমন্ডল ঢাকা থাকায় ডাক্তার রায় এ প্রশ্ন করলেন।

আলখেল্লাধারী এবার বললো—আমার নাম জানতে চাও?

ডাক্তার রায় নিজেকে সংযত করে নিয়ে বললেন—হাঁ, আমি জানতে চাই তুমি কে? এবং এত রাতে আমার ল্যাবরেটরীর ব্যালকনিতে কেন?

তোমার প্রথম প্রশ্নের জবাব আমি তোমার একজন মঙ্গলকামী বন্ধু, আর দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব হলো বিশেষ কোনো প্রয়োজনে আমি এখানে এসেছি। কথা বলতে বলতে এগুচ্ছিলো আলখেল্লাধারী।

ডাঃ রায়ের মুখে বিস্ময় ছড়িয়ে পড়েছে, তিনি আলখেল্লাধারীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে দেখছিলেন।

আলখেল্লাধারী একটু হেসে বললো—তোমার মঙ্গলকামী বন্ধু হলেও এর পূর্বে আমাকে তুমি দেখোনি, তাই আজ ভালভাবে লক্ষ্য করেও চিনতে পারবে না। এবার বলি কেন আমি এসেছি।

ডাঃ রায় প্রশ্নভরা দৃষ্টি তুলে তাকালেন আলখেল্লাধারীর মুখে। আলখেল্লাধারীর মুখ দেখা না গেলেও তার চোখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো।

ডাঃ রায়কে লক্ষ্য করে বললো আলখেল্লাধারী—তুমি আমার শিকারগুলো রোজ কেটে তার হৃৎপিন্ড পরীক্ষা করে দেখো। কিন্তু কিছু বুঝতে পেরেছো— কেন আমি হত্যা করি প্রতি অমাবস্যায়?

তুমি—তুমিই এই রহস্যময় হত্যাকারী?

হাঁ।

তুমি কি দস্যু বনহুর?

না।

তাহলে কে তুমি?

আমি পূর্বেই বলেছি নাম আমি বলবো না, তবে যেদিন আমি সবার কাছে নিজকে বিকাশ করবো, সেদিন আমার সাধনা শেষ হবে।

সাধনা?

হাঁ, সাধনাই বটে।

মানুষ হত্যা করে তুমি সাধনা করছো?

আজ নতুন এ কথা শুনলে বলে মনে হচ্ছে। পৃথিবীর বুকে কত রকম সাধনা আছে তার কোনো সঠিক হিসেব নেই। যাক, এবার শোন কেন এসেছি।

বলো?

যা বলবো তাই করতে হবে। যদি না করো তাহলে আগামী অমাবস্যায় তোমাকে আমি আমার সাধনার শিকার হিসেবে ব্যবহার করবো। পুলিশমহল বা অন্য কেউ আমার কাজে বাধা দিতে পারবে না। কাজেই......

কাজেই কি করতে হবে বলো?

তুমি পোষ্টমর্টেমের রিপোর্ট এমনভাবে তৈরি করবে যাতে পুলিশমহল এবং লোকসমাজ জানতে পারে এ হত্যাকান্ড কোনো জানোয়ার দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে।

এতবড় মিথ্যা......

হাঁ, তোমাকে মিথ্যা লিখতে হবে, মিথ্যা রিপোর্ট তৈরি করতে হবে।

কিন্তু...

জানি এতদিন সত্য রিপোর্ট তৈরি করেছো। এবার তোমাকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে প্রাণের বিনিময়ে। অবশ্য তুমি যা চাও তাই পাবে। আমাকে সাধনায় জয়ী হতে দাও...এই নাও। আলখেল্লাধারী তার দক্ষিণ হাতখানা বের করে এগিয়ে ধরলো ডাঃ রায়ের সম্মুখে।

ডাঃ রায়ের দু'চোখ ছানাবড়া হলো, দেখলেন আলখেল্লার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা লোমশ হাত। হাতের মুঠায় একগাদা নোট। ডাঃ রায় ভয়কম্পিত হাতে টাকার গাদা তুলে নিলেন হাতে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে ল্যাবরেটরীতে প্রবেশ করলেন মিঃ জাফরী, তিনি এতক্ষণ আড়াল থেকে সব শুনছিলেন এবং দেখছিলেন।

রিভলভার উঁচিয়ে ধরলেন মিঃ জাফরী—খবরদার! পালাতে চেষ্টা করো না, মরবে।

ডাঃ রায় এবং আলখেল্লাধারী একসঙ্গে ফিরে দাঁড়িয়ে চমকে উঠলো। পর মুহূর্তেই ডাঃ রায়ের মুখমন্ডল খুশীতে দীপ্ত হয়ে উঠলো। মিঃ জাফরীকে দেখে তিনি যেন দেহে প্রাণ ফিরে পেলেন।

কিন্তু মুহূর্তে এক কান্ড ঘটে গেলো—আলখেল্লাধারী ফিরে দাঁড়িয়েই চোখের নিমিষে প্রচন্ড এক ঝটকায় মিঃ জাফরীর হাত থেকে রিভলভার ফেলে দিয়ে লাফিয়ে পড়লো ব্যালকুনি থেকে নীচে।

এত দ্রুত ব্যাপারটা ঘটে গেলো যে, মিঃ জাফরী ক্ষণিকের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। পরক্ষণেই ছিটকে পড়া রিভলভার তুলে নিয়ে নীচে অন্ধকার লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লেন।

ডাঃ রায়ও কেমন যেন হতভম্ব হয়ে পড়েছেন—একি! তিনি স্বপ্ন দেখছেন না সত্য।

মিঃ জাফরী ব্যালকুনি থেকে ফিরে এসে বললেন—ব্যর্থ হলাম ডাঃ রায়। রহস্যময় হত্যাকান্ডের নায়ককে এত কাছে পেয়েও গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলাম না।

ডাঃ রায় ধপ্ করে একটা সোফায় বসে পড়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগলেন। তিনি যেন কিছু বুঝতে পারছেন না, এখনও তাঁর মুঠায় আলখেল্লাধারীর দেওয়া একতাড়া নোট।

মিঃ জাফরী নিজেকে সংযত করে নিয়ে বললেন আবার—হঠাৎ জরুরী প্রয়োজনে এসে পড়ি, উপরে উঠে আসতেই শুনতে পাই একটা অপরিচিত এবং চাপা কণ্ঠস্বর। তখন আড়ালে লুকিয়ে পড়ি। শুনতে চেষ্টা করি, কে—আর কি কথা হচ্ছে! কিন্তু...

ডাঃ রায় অবাক হয়েছিলেন। হঠাৎ মিঃ জাফরী অসময়ে কোথা থেকে এসে তাকে এভাবে বাঁচিয়ে নিলেন। নাহলে তাঁর ভাগ্যে যে কি ছিলো কে জানে। এবার তিনি ঢোক গিলে বললেন—স্যার, আপনি না এলে খুনী হয়তো আমাকে হত্যা করেই পালাতো।

মিঃ জাফরী বললেন—না, সে আপনাকে হত্যা করতো না, কারণ যে মিথ্যা রিপোর্ট আপনাকে সে তৈরি করতে বললো তা তৈরি না হলে লোকসমাজ এবং পুলিশমহল তাকে সদা অনুসন্ধান করে ফিরবে......

কিন্তু আমার বিপদ যে আরও জমাট বেঁধে উঠলো স্যার?

বুঝেছি, আমি আড়াল থেকে সব শুনে ফেলেছি বলে খুনী আপনাকে সন্দেহ করবে, তাই ভয় পাচ্ছেন?

হাঁ, সে নিশ্চয়ই আবার আসবে, কারণ সে যে কারণে এসেছিলো তা সফল হলো না।

মিঃ জাফরী গম্ভীরভাবে বললেন—হুঁ, সত্যি এটা আপনার পক্ষে চিন্তার কারণ।

এখন কি করা যায় বলুন স্যার?

ভয় পেলে চলবে কেন ডাঃ রায়। বিপদের সঙ্গে বোঝাপড়া করাই তো বীর পুরুষের কাজ। এতে খুনীর অনেক কিছু প্রমাণ পাওয়া গেলো।

ডাঃ রায়ের ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। চোখে-মুখে একটা ফ্যাকাশে ভাব।

মিঃ জাফরী বললেন—বড্ড ঘাবড়ে গেছেন ডাঃ রায়?

না, ঠিক ঘাবড়ে যাইনি তবে আশ্চর্য হয়েছি।

কারণ?

একটা লোমশ হাত কিন্তু ঠিক মানুষের মত।

আপনার কি মনে হয় হাতখানা মানুষের নয়?

মানুষের তো বটেই তবে সন্দেহ জাগছে।

সন্দেহ।

হাঁ, মানুষের হাত—কিন্তু এত লোমশ কেন? ডাঃ রায়ের চোখেমুখে এক বিস্ময়কর ভাব ফুটে উঠেছে।

ব্যাপারটা পরদিন পুলিশমহলে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করলো। সেই রহস্যময় হত্যাকান্ডের নায়ক স্বয়ং গতরাতে ডাঃ রায়ের বাসভবনে গিয়ে হাজির হয়েছিলো। মিঃ জাফরী এবং ডাঃ রায় তাকে প্রকাশ্য দেখেছেন কিন্তু তার শরীরে আলখেল্লা পরা থাকায় তাকে চিনতে পারেননি কে সে।

কথাটা সংবাদপত্রেও প্রকাশ পেলো বিরাট বিরাট অক্ষরে।

ডাক্তার রায় কিন্তু ভীত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। না জানি তাঁর ভাগ্যে কি আছে কে জানে। কবে কোথায় তাঁর প্রাণহীন দেহ পড়ে থাকবে, লোকে দেখবে ডাঃ রায়ের শেষ পরিণতি।

সমস্ত শহরে আতঙ্ক আরও বেড়ে গেলো।

পুলিশমহলের এত প্রচেষ্টা সব ব্যর্থ হতে চলেছে।

রহস্যময় হত্যাকান্ডের কোনো সমাধান হলো না।

কে এই হত্যাকারী আর কেনই বা সে হত্যা করে চলেছে, এর কোনো সঠিক সন্ধান কেউ পেলো না।

❑

সেদিন চৌধুরীবাড়ির সম্মুখে কয়েকটা ছেলে মিলে খেলা করছিলো। তাঁদের মধ্যে নূরও ছিলো।

এমন সময় একটা গাড়ি এসে থামলো।

নূর আনন্দধ্বনি করে উঠলো—আব্বু, আব্বু...

অন্য ছেলেরা সবাই তাকালো গাড়িখানার দিকে।

গাড়িখানা একটু এগিয়ে পুনরায় পিছু হটে এলো। ততক্ষণে নূর গাড়িখানার পাশে ছুটে এসে পড়েছে।

বনহুর গাড়ি থেকে নেমে পড়লো, নূরকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বললো—কেমন আছো নূর?

অভিমানে নূরের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো, বললো—তুমি কতদিন আসোনি, আমার মোটেই ভাল লাগে না আব্বু। তা ছাড়া বড্ড ভয় লাগে, তুমি জানো তো দস্যু বনহুর প্রতি অমাবস্যায় একটা করে মানুষ হত্যা করে?

কে বললো তোমাকে দস্যু বনহুর এই হত্যা করে?

কেন, সংবাদপত্রে জানতে পেরেছি। তা ছাড়া সবাই বলে। ঐ যে আমার বন্ধু ওরাও বলে।

নূরের বন্ধুরা সবাই কাছে এসে পড়েছে।

বনহুর ওদের দিকে তাকাতেই ওদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠলো—সত্যিই এসব হত্যাকান্ড দস্যু বনহুর করে। আমার আব্বা বলেছেন।

অপর একজন বললো—আমার আব্বাও বলেন দস্যু বনহুর নাকি মানুষ হত্যা করে তার চোখ তুলে নেয়।

অন্য একজনও বললো—আমার আম্মাও বলেন, দস্যু বনহুর ছাড়া কেউ এমন করে মানুষ হত্যা করতে পারবে না।

বনহুরের সুন্দর মুখখানা কঠিন হয়ে উঠলো, কিন্তু পরক্ষণেই নিজকে সংযত করে নিয়ে বললো—দস্যু বনহুর হত্যা করে কাদের, যারা অন্যায় করে তাদের, বুঝলে? এখন যারা নিহত হচ্ছে তারা তো জনগণ। কোনো অন্যায় তারা করেনি তবু তাদের হত্যা করা হচ্ছে, কাজেই...কথা শেষ না করেই বনহুর নূরের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—তুমি খেলা শেষ করে এসো, কেমন?

আচ্ছা আব্বু। নূর পিতার হাত ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

বনহুর গাড়িতে চেপে বসে ষ্টার্ট দেয়।

দারোয়ান গেট খুলে দেয়।

আলগোছে বনহুরের গাড়িখানা এসে থামলে চৌধুরীবাড়ির গাড়ি বারান্দায়।

সরকার সাহেব বনহুরকে দেখে খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। তিনি দু'হাত বাড়িয়ে দেন বনহুরের দিকে।

বনহুর ছোট্ট শিশুর মত বৃদ্ধ সরকার সাহেবের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। বহুদিন পর পুত্রসমতুল্য মনিরকে সরকার সাহেব বুকে পেয়ে আনন্দে গদ গদ হয়ে উঠলেন। তারপর বললেন—কেমন আছো বাবা মনির?

ভালই ছিলাম সরকার চাচা। আপনি কেমন আছেন?

ভালই ছিলাম, তবে বুড়ো হয়েছি সব সময় অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে।

মা কেমন আছেন?

তিনি ভাল নেই। সব সময় তোমার জন্য তাঁর চিন্তা।

মা বড্ড অবুঝ, তাই না সরকার চাচা?

বাবা, তুমি বুঝবে না সন্তানের জন্য মা-বাপের কত ব্যথা, কত দুশ্চিন্তা।

অহেতুক তাঁরা সন্তানের জন্য ভাবেন।

সরকার সাহেব অন্তঃপুরের দিকে পা বাড়াতেই বনহুর চাচার হাত ধরে বললো—আপনি একটু বসুন সরকার চাচা।

সরকার সাহেব কিছু বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইলেন থ' মেরে।

বনহুর পা টিপে টিপে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলো। আচমকা সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে এই উদ্দেশ্য। বনহুর সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলো।

এমন সময় মনিরার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—হোসেন, হোসেন, এক গ্লাস পানি নিয়ে আয়...হোসেন তখন নীচের তলা থেকে বললো—আসছি আপামনি।

বনহুর সিঁড়ির উপরে একটু অপেক্ষা করতেই হোসেন এক গ্লাস পানি নিয়ে এগিয়ে এলো। সিঁড়ির উপরে মনির ভাইকে দেখে আনন্দে চীৎকার করতে গেলো।

বনহুর ঠোটে আংগুল চাপা দিয়ে বললো—চুপ! সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে হোসেনের হাত থেকে পানির গেলাসটা নিয়ে বললো—তুই যা হোসেন, কাজ করগে......

হোসেন তো অবাক, সে তাকিয়ে রইলো।

বনহুর পানির গ্লাস হাতে উঠে গেলো উপরে।

হোসেন একটু হেসে পুনরায় কাজে চলে গেলো।

বনহুর পানির গ্লাস হাতে মনিরার কক্ষে প্রবেশ করে দেখলো, মনিরা ওদিকে মুখ ফিরিয়ে সংবাদপত্র পড়ছে। গত অমাবস্যা রাতের রহস্যময় হত্যাকান্ডের সংবাদ মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলো সে।

বনহুর পানির গ্লাস হাতে আলগোছে মনিরার পিছনে এসে দাঁড়ায়, পানির গ্লাসটা এগিয়ে ধরে।

মনিরা রাগতভাবে বলে—এত দেরী করলি কেন? আমার ডাক কানে যায়নি বুঝি?

কোনো জবাব পায় না।

মনিরা সংবাদপত্রে দৃষ্টি রেখেই পানির গ্লাসটা তুলে নিলো হাতে, তারপর পানিটা খেয়ে পুনরায় গ্লাসটা ফিরিয়ে দিয়ে বললো—যা, এবার কাজ করগে।

উঁ হুঁ, যাবো না......গ্লাস হাতে নিয়ে বললো বনহুর।

চমকে ফিরে তাকালো মনিরা।

আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠলো ওর চোখ দুটো—তুমি?

বনহুর গ্লাসটা পাশের টেবিলে রেখে মনিরাকে টেনে নিলো কাছে—হোসেনকে খুব বকে দিলে, না?

এখনও তোমার দুষ্টামি গেলো না। ছাড়ো বলছি......

না।

নূর এসে পড়বে।

আসুক।

মামীমা আসবেন।

এলোই বা......

তুমি বড্ড.....

দুষ্ট, এইতো......আরও নিবিড়ভাবে টেনে নেয় ওকে।

মনিরা স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে বলে—তোমার নামে এত মিথ্যা গুজব আর যে আমি শুনতে পারি না।

বনহুর বুঝতে পারে সংবাদপত্রই শুধু নয়, কান্দাইয়ের প্রতিটি মানুষ তার নামে এই হত্যারহস্য নিয়ে নানা রকম গুজব ছড়িয়ে চলেছে। কোনো স্ত্রী স্বামীর নামে এতকিছু শুনে নীরবে হজম করতে পারে? বনহুর মনিরার মুখখানা তুলে ধরে বলে—গুজবে কান দিও না মনিরা। লোকের বলাতে আমার কিছু আসে যায় না। তাছাড়া ওরা যা বলে—সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়।

তুমি—তুমি এই হত্যারহস্যের সঙ্গে জড়িত আছো?

হ্যাঁ, আমি হত্যা না করলেও এ হত্যারহস্যের সঙ্গে জড়িত আছি। সদাসর্বদা আমি সন্ধান করে ফিরছি কে এই হত্যাকারী এবং তার হত্যার উদ্দেশ্য কি।

এটা কি হত্যারহস্যের সঙ্গে জড়িত থাকা বলে?

হাঁ, কেন বলব না। আমিও তো এ হত্যারহস্যের মধ্যেই একজন। মনিরা, দোয়া করো আমি যেন এই হত্যাকারীকে সমুচিত শাস্তি দিতে পারি।

আমার কেমন যেন ভয় হচ্ছে...

নারীমন বড় দুর্বল মনিরা। তোমরা একটুতেই ঘাবড়ে যাও। জানো মনিরা, আমি অনেকদূর অগ্রসর হয়েছি এ ব্যাপারে। খুনীকে আবিষ্কার করতে আর আমার বিলম্ব হবে না। তবে খুনীর হত্যারহস্য উদঘাটন না করা পর্যন্ত আমি তাকে কিছু বলবো না। হয়তো আরও দু'একটা প্রাণ বিনষ্ট হবে।

তুমি খুনীর সন্ধান পেয়েও তাকে আরও প্রাণ নষ্ট করার সুযোগ দেবে?

তা না হলে হত্যারহস্য উদঘাটিত হবে না, কাজেই...

কিন্তু তোমার তো কোনো বিপদ আসবে না?

মনিরা, ভয় পেয়ো না। হত্যাকারীর শেষ শিকার হিসেবে আমিই যাবো তার পাশে, হয় মৃত্যু নয় হত্যাকারীর সাধনার অবসান...

মনির!

চমকে উঠলে?

তুমি এতবড়—

বলো, থামলে কেন? ভীরু কাপুরুষ না নির্ভীক—বলো কোন্‌টা বলতে চাও তুমি?

কিছুই বলতে চাইনা। যা খুশী করো, কোনোদিন তুমি স্থির হবে না।

স্থির! স্থির হবো সেদিন যেদিন চিরনিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়বো। আর তোমাকে বিরক্ত করতে আসবো না মনিরা তখন—

চুপ করো। ওসব শুনতে চাই না। বলো এতদিন পরে এলে কেন?

মনিরা কথাটার মোড় ফেরাতে চেষ্টা করে।

বনহুর মনিরার মনোভাব বুঝতে পেরে হেসে বলে—তুমি না চাইলেও একদিন তোমার মনির ক্লান্ত শ্রান্ত নিস্পন্দ অসাড় হয়ে পড়বে, এ কথা তুমি অস্বীকার করতে পারবে না মনিরা। থাক্ তুমি যা জিজ্ঞাসা করলে তার জবাব দিচ্ছি। হঠাৎ সেদিন তোমার এখান থেকে যখন আর্ত চীৎকার শুনে চলে গেলাম, তারপর কি হলো সব আজ তোমাকে বলবো—

তুমি না বললেও আমি আন্দাজে যা বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটাও তাই ঘটেছিলো, কারণ সংবাদপত্রে পরদিন তোমাকে গ্রেপ্তার ব্যাপার নিয়ে পুলিশমহল যে সংবাদ পরিবেশন করেছিলো তা থেকে আমি সব বুঝে নিয়েছি।

তাহলে তো তুমি সবকিছুই জানো।

কিন্তু—

তা ছাড়াও আরও একটা—

বিপদে পড়েছিলে?

বিপদ নয়, একটা সমস্যা—জম্বু আস্তানায় জংলীরা আক্রমণ চালিয়ে জম্বু আস্তানার সর্দার সেলিম খান ও অন্যান্য অনুচরকে পাকড়াও করে নিয়ে গিয়েছিলো।

জম্বু আস্তানায় জংলীরা আক্রমণ চালিয়ে...

হঁ।

তারপর?

তারপর জংলীদের সঙ্গে যুদ্ধ হলো।

তুমি কান্দাই থেকে তোমার অনুচরদের নিয়ে গিয়েছিলে?

না।

তবে?

আমি আর রহমান।

তোমরা দু'জন মিলে...

হাঁ, আমরা দু'জন মিলেই যুদ্ধ করেছি।

পরাজিত হয়েছো না জয়লাভ করেছো?

তোমার স্বামী পরাজয় বরণ করে ফিরে আসবে, এ কথা তুমি ভাবতে পারলে মনিরা? যেদিন পরাজিত হবো সেদিন আমার জীবনের সমাপ্তি—

এমন সময় মরিয়ম বেগমের আনন্দভরা কণ্ঠস্বর শোনা যায়— মনির, বাবা মনির এসেছিস—

বনহুর তাড়াতাড়ি মনিরার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে—মা, মাগো...

কখন এলি বাবা?

এই তো একটু আগে। কেমন আছো মা?

ভাল। তুই কেমন ছিলি?

খুব ভাল।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি। এত রোগা হয়ে গেছিস বাবা। এতোদিন কোথায় ছিলিরে?

বাংলাদেশে।

বাংলাদেশে? যেখানে বাঙালী আর অবাঙালী যুদ্ধ হলো সেই বাংলাদেশে?

হাঁ মা।

সংবাদপত্রে পড়েছি অনেক কথা, সব সত্যি নাকিরে?

সব সত্যি। সে এক বিস্ময়কর ইতিহাস।

চল্ বিশ্রাম করবি চল্, সব পরে শুনবো।

চলো মা, কতদিন তোমার হাতের রান্না খাইনি।

মরিয়ম বেগমের দু'চোখ অশ্রু ছলছল হয়ে উঠে। সত্যি কতদিন তিনি মনিরকে নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়াননি। মরিয়ম বেগম পুত্রসহ নিজের কক্ষে গেলেন।

মনিরা ততক্ষণে মামীমার ঘরে এসে হাজির হয়েছে। মরিয়ম বেগম বললেন—তুমি ওর বিশ্রামের আয়োজন করো মা, আমি যাই খাবার আনিগে।

তুমি বরং ওর সঙ্গে কথা বলো মামীমা, আমি যাচ্ছি।

কিন্তু মরিয়ম বেগম ততক্ষণে বেরিয়ে গেছেন।

মনিরাও বেরিয়ে যাচ্ছিলো, বনহুর পেছন থেকে ওর আঁচল টেনে ধরে ফেলে।

মনিরা মৃদু হেসে স্বামীর দিকে ফিরে তাকায়।

বনহুর বলে—বেশিক্ষণ থাকছি না, তুমি যেও না মনিরা। যতক্ষণ থাকি তুমি আমার পাশে থাকো...

মনিরা বনহুরকে এমন করে কোনোদিন বলতে শোনেনি, আজ বনহুরের কণ্ঠে যেন কেমন একটা করুণ সুর। একটু হেসে বললো—তুমি বেশিক্ষণ থাকতে না চাইলেই ছাড়বো নাকি?

আজ তোমাকে ছাড়তেই হবে, কারণ......

কোনো কারণ আমি শুনতে চাই না।

লক্ষ্মীটি......

উহুঁ, আজ কোনো কথা তোমার শুনবো না। যেতে দেবো না তোমাকে......

আজকের মত যেতে দাও, জরুরী একটা কাজ আছে।

তবে এলে কেন?

অনেকদিন তোমাদের দেখিনি কিনা, তাই—বনহুর মনিরাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে।

মামীমা, এক্ষুণি এসে পড়বে। ছাড়ো বলছি......

মা এখন রান্নাঘরে......

মনিরা কিছুতেই স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারলো না।

❑

গভীর রাত।

সমস্ত শরীর আলখেল্লায় ঢাকা একটা লোক গাড়ি ড্রাইভ করে চলেছে। পথঘাট নির্জন, তাই সে স্বচ্ছন্দে গাড়ি চালাচ্ছে। কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না। গাড়ির পিছন আসনে কয়েকটা বাক্স। আলখেল্লার মধ্য থেকে যে দু'টি হাত গাড়ির হ্যান্ডেল ধরে আছে, সে দু'টি হাত সাধারণ মানুষের নয়, লোমশ দু'টি হাত।

মাঝে মাঝে আলখেল্লাধারী তার গাড়ির সম্মুখে ট্রান্সমিটার থেকে শর্টওয়েভ বেতারে চাপাকণ্ঠে সাংকেতিক ভাষায় কথা বলছে। যখন সে সাংকেতিক ভাষায় কথা বলছিলো তখন একটা নীলাভ আলো জ্বলছিলো গাড়ির হ্যান্ডেলের মধ্যে।

অদ্ভুত এ গাড়ি, চলাকালে কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

গাড়িখানা ঘন্টায় পঁচাত্তর মাইল স্পীডে চলেছে। এক সময় গাড়িখানা শহরের নির্জন পথ ছেড়ে পাথরকাটা পথ ধরে চলতে শুরু করলো। উঁচুনীচু এবড়ো থেবড়ো পথ তবু গাড়িখানার গতি কমেনি। গাড়িখানা যেন লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে।

আলখেল্লার মধ্যে গাড়ির চালকের চোখ দুটো যেন জ্বলছে। কখনও কখনও পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখছিলো আলখেল্লাধারী। কেউ তার গাড়িখানাকে ফলো করছে কিনা এটাই তার লক্ষ্য।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রান্তর। এবার গাড়িখানা সেই প্রান্তর দিয়ে এগিয়ে চললো। মাঝে কোথাও কোথাও আগাছা ঝোপঝাড়।

গাড়ির সার্চলাইটের আলো যখন এসব আগাছা এবং ঝোপঝাড়ের উপর পড়ছিলো তখন মনে হচ্ছিলো যেন এক একটা দৈত্য। আরও কিছুক্ষণ চলার পর দেখা গেলো পর্বতমালা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

একপাশে সবুজ ঘাসে ঢাকা বিস্তৃত প্রান্তর আর একপাশে পর্বতমালা। অপরূপ বৈচিত্রময় জায়গাটা। গাড়িখানা এখানে এসে থামলো। লোকালয় থেকে বহুদূর এই কান্দাই পর্বতমালা।

গাড়িখানা আবার চলতে শুরু করলো।

এবার পর্বতমালার পাদদেশ দিয়ে এগুচ্ছে। গাড়ির গতি পূর্বের চেয়ে মন্থর। অদূরে পর্বতের ভিতর দিয়ে একটা সুড়ঙ্গপথ।

গাড়িখানা এই সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করলো।

আলখেল্লাধারী এখনও মাঝে মাঝে ট্রান্সমিটার থেকে বেতারে কথা বলছে।

সুড়ঙ্গপথ চলে গেছে পর্বতমালার গভীর তলদেশ দিয়ে কোন্ অজানা দেশে কে জানে।

সমস্ত রাত একটানা গাড়িখানা এগিয়ে চললো, ভোর হবার পূর্বে পর্বতমালার ওপাশে সুড়ঙ্গমুখে এসে পৌঁছলো গাড়িখানা।

আর একটা অদ্ভুত ধরনের গাড়ি সুড়ঙ্গমুখে অপেক্ষা করছিলো। গাড়িখানা নীলাভ রঙের। গাড়ির সম্মুখভাগ ঠিক একটা বোইং প্লেনের মত। গাড়ির চালকটাও ঠিক তেমনি অদ্ভুত। শরীরে নীলাভ আলখেল্লা, মুখে এবং কানে শব্দযন্ত্র মেশিন ধরা। কতকটা পাইলটের ড্রেসের মত লাগছে লোকটার দেহের ড্রেস।

গাড়িখানা পৌঁছতেই দুই ড্রাইভারের মধ্যে কোনো কিছু নিয়ে কথাবার্তা হলো। তারপর গাড়ি থেকে বাক্সগুলো এক একটা করে নামিয়ে ফেললো দু'জনে ধরাধরি করে।

একটা, দুটো, তিনটা, চারটা অদ্ভুত ধরনের বাক্স। বাক্সগুলো এক একটা ব্লাড ব্যাংকের মত দেখতে কিন্তু আকারে চারকোণা এবং বড়। ভিতরে কি আছে বোঝা না গেলেও লোক দু'জন অতি সাবধানে এই বাক্সগুলো নাড়াচাড়া করছিলো। তাতে মনে হচ্ছিলো বাক্সের মধ্যে অতি মূল্যবান কোনো সামগ্রী রয়েছে।

লোমশদেহী ড্রাইভারটা তার গাড়ি থেকে চারটা বাক্স এরোপ্লেন আকার গাড়িখানায় তুলে দিলো। তারপর সাংকেতিক ভাষায় কি সব কথাবার্তা হলো তাদের মধ্যে। একটা চেক দিলো ঐ অদ্ভুত গাড়ির ড্রাইভার লোমশদেহী ড্রাইভারটার হাতে।

উভয়ে করমর্দন করে উভয়কে বিদায় সম্ভাষণ জানালো।

তারপর অদ্ভুত গাড়িখানায় চেপে বসলো অদ্ভুত ড্রেস পরিহিত ড্রাইভারটা। গাড়িখানা এবার চলতে শুরু করলো, কিছুদূর এগুতেই গাড়ির দু'পাশে দুটো পাখা বেরিয়ে এলো। শূন্যে ভেসে উঠলো গাড়িখানা ঠিক প্লেনের মত, অমনি গাড়ির চাকাগুলো গাড়ির পেটের ভিতর প্রবেশ করলো।

একটা ঈগল পাখির মত উড়ে চললো এবার মোটরখানা।

লোমশদেহী ড্রাইভার তার গাড়ি নিয়ে ফিরে চললো সুড়ঙ্গপথে।

গাড়িখানা যখন সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করে বেরিয়ে এলো তখন গাড়িখানার খোলস বদলে গেছে। এখন গাড়িখানাকে দেখলে পূর্বের সেই অদ্ভুত গাড়ি বলে মনে হয় না। লোমশদেহী লোকটাও নেই গাড়ির সামনে। অন্য একটা ভদ্রলোক গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এলো। এখন গাড়িখানা বেশ শব্দ করে চলেছে।

পর্বতমালা শেষ করে পাথুরিয়া পথ। তারপর সবুজ প্রান্তর। গাড়িখানা এক সময় কান্দাই জনমুখর রাজপথে উঠে এলো। মিশে গেলো অন্যান্য গাড়ির সঙ্গে।

অদ্ভুত মানুষের অদ্ভুত কান্ড, অদ্ভুত তার কার্যকলাপ, কিন্তু কে সে?

❑

শুধু পুলিশমহলই নয়, শহরের জনগণের মনেও দারুণ একটা উদ্বিগ্নতা। আজও এই রহস্যময় হত্যাকান্ডের কোনো সমাধান খুঁজে পাওয়া গেলো না।

মিঃ জাফরী এবং তাঁর দলবল সবাই সমস্ত শহর তন্ন তন্ন করে খানাতল্লাশি চালিয়েও এই হত্যা রহস্যের এতটুকুও 'ক্লু' আবিস্কারে সক্ষম হননি।

ডাঃ রায় প্রৌঢ় অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনিও এই হত্যারহস্য নিয়ে পলিশমহলের সঙ্গে সদা-সর্বদা সহযোগিতা করে চলেছেন। জনগণের মঙ্গলই তাঁর কামনা। কিন্তু সেই রাতের পর থেকে তিনি যেন কেমন ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছেন, সর্বক্ষণ তাঁকে চিন্তাগ্রস্ত বলে মনে হয়।

মিঃ জাফরী এবং কান্দাই পুলিশ সুপার এই রাতের পর থেকে তাঁর বাড়িতে কড়া পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করেছেন যেন পুনরায় সেই লোমশদেহী তাঁর বাড়ি বা ল্যাবরেটরীতে হানা না দিতে পারে।

ডাঃ রায় তবু যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না, কারণ লোমশদেহী যা যা বলেছিলো তা তিনি পূরণ করতে পারেননি। কাজেই ভয় একটা তাঁর রয়েই গেছে। লোমশদেহীর শেষ কথাটা এখনও তাঁর কানের কাছে সর্বদা প্রতিধ্বনি জাগায়।

সেদিন হঠাৎ মিঃ জাফরীর অফিসে ডাঃ রায় গিয়ে হাজির।

মিঃ জাফরী ফোনে কার সঙ্গে যেন আলাপ করছিলেন, ডাঃ রায় কক্ষে প্রবেশ করতে তিনি রিসিভারের মুখে হাত রেখে বললেন—বসুন।

ডাঃ রায় আসন গ্রহণ করলেন।

মিঃ জাফরী তখনও কথা বলে চলেছেন—হ্যালো, হাঁ আর মাত্র কয়েকদিন আছে অমাবস্যার...আমাদের যতদূর সামর্থ্য আমরা এই হত্যাকান্ড বন্ধ করার চেষ্টা চালাচ্ছি....বলুন...খুনী ঠিক অমাবস্যা রাতে তার সাধনা চালায় কেন, তা কেমন করে বললো....তবে আমার মনে হয় এই হত্যাকান্ডের পিছনে গভীর এক রহস্য লুকিয়ে আছে...হ্যাঁ, ডাঃ রায় এ হত্যা রহস্যের কোনো 'ক্লু' এখনও পোষ্টমর্টেমে পাননি বলেই জানিয়েছেন। আচ্ছা, তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করে আপনাকে জানাবো...থ্যাঙ্ক ইউ...রিসিভার রাখলেন মিঃ জাফরী।

ডাক্তার রায় একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে বললেন—কে কথা বলছিলেন?

কান্দাই শহরের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ডক্টর হিরন্ময়।

অস্ফুট কণ্ঠে বললেন ডাক্তার রায়—ডক্টর হিরন্ময়।

হাঁ। লোকটাকে আপনার কেমন মনে হয়?

অতি মহৎ লোক ডক্টর হিরন্ময় কিন্তু......

বলুন থামলেন কেন?

কিন্তু লোকটা একেবারে অদ্ভুত। বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্বন্ধ নেই। সারাটা দিন নিজের ল্যাবরেটরী নিয়ে মশগুল থাকেন।

আমি তাঁর সঙ্গে বেশিক্ষণ আলাপ করার সুযোগ পাইনি তবু তাঁকে যতটুকু জেনেছি তাতে আমার মনে হয় লোকটা মহৎ হলেও একটু আত্মগর্বিত। কথা কম বলেন।

হাঁ স্যার, ডক্টর হিরন্ময়ের এটা স্বভাব।

কিন্তু আজ তিনি ফোনে বেশ কথাবার্তা বলছিলেন। এই রহস্যময় হত্যা ব্যাপার নিয়ে তাঁর উদ্বিগ্নতার সীমা নেই দেখলাম।

স্যার, লোকটা অদ্ভুত, কখনও বেশ কথাবার্তা বলেন—আবার কখনও একেবারে গম্ভীর হয়ে পড়েন, যেন কোনো কথাই তিনি জানেন না। মাঝে মাঝে তিনি আমার ল্যাবরেটরীতে আসেন, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

আচ্ছা ডাঃ রায়, আপনি তো জানেন এই ডক্টর হিরন্ময় কান্দাই শহরে কতদিন আছেন? মানে কতদিন তিনি এই ল্যাবরেটরী স্থাপন করেছেন?

আমি যতদূর জানি খুব বেশি দিন হলো না তিনি ল্যাবরেটরী স্থাপন করেন। কান্দাই শহরে আসার পূর্বে ডক্টর হিরন্ময় কোথায় ছিলেন কেউ জানেন না।

মিঃ জাফরীর ভ্রু কুঞ্চিত হলো, তিনি গভীরভাবে কিছু চিন্তা করতে লাগলেন।

ডাঃ রায়ও কিছুক্ষণ নীরব রইলেন।

কক্ষে একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো। হঠাৎ মিঃ জাফরী বলে উঠলেন—ডাঃ রায়, আপনি কি এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে ডক্টর হিরন্ময়ের ল্যাবরেটরীতে যেতে পারেন?

নিশ্চয়ই......

তবে চলুন না লোকটার সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হয়ে আসি। অবশ্য শঙ্কর রাও এই মহৎ ব্যক্তির উপর কড়া নজর রেখেছেন...

মানে তাঁর কার্যকলাপ লক্ষ্য করছেন, এই তো?

হাঁ।

সন্দেহজনক কিছু কি......

না, তাঁর চালচলন সন্দেহজনক বলে মনে হলেও তাঁর কার্যকলাপে তেমন কোনো সন্দেহজনক কিছু ধরা পড়েনি বলে তিনি জানিয়েছেন।

• ডাঃ রায় একটু হেসে বললেন—স্যার, বৈচিত্রময় পৃথিবীর বিচিত্র মানুষ, কাজেই মানুষের উপরের রূপ তার আসল রূপ নয়।

তাই তাদের চেনা মুস্কিল। কথাটা বলতে বলতে কক্ষে প্রবেশ করলেন মিঃ ফেরদৌস।

মিঃ জাফরী এবং ডাঃ রায় মিঃ ফেরদৌসের দিকে ফিরে তাকাতেই মিঃ ফেরদৌস হাত বাড়িয়ে উভয়ের হ্যান্ডসেক করলেন।

মিঃ জাফরী বললেন—বসুন মিঃ ফেরদৌস।

মিঃ ফেরদৌস আসন গ্রহণ করলেন।

ডাঃ রায় বললেন—আপনি এসে পড়ায় আমরা খুশী হয়েছি মিঃ ফেরদৌস।

কারণ?

মিঃ জাফরী বললেন—ডক্টর হিরন্ময়ের ওখানে যাবো, আপনিও আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

ডক্টর হিরন্ময়ের ওখানে......

হাঁ, তাঁকে আপনি চেনেন?

চিনি।

লোকটাকে আপনার কেমন মনে হয়?

রহস্যময় অদ্ভুত মানুষ।

তাই বলছিলাম তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করে তাঁর হাবভাব জানতে চাই।

বেশ তো, চলুন!

মিঃ জাফরী, ডাক্তার রায় এবং মিঃ ফেরদৌস উঠে পড়লেন।

মিঃ জাফরী বললেন—আপনারা আমার গাড়িতেই চলুন।

তিনজন জাঁদরেল পুলিশ গোয়েন্দা ডক্টর হিরন্ময়ের বাড়ি অভিমুখে যাত্রা করলেন।

ডক্টর হিরন্ময়ের বাসভবনে পৌঁছে অবাক হলেন এই তিন গোয়েন্দা পুলিশ অফিসার। ডক্টর হিরন্ময় গাড়ি বারান্দায় পায়চারী করছিলেন। তিনি যেন পূর্ব হতেই জানতেন এঁরা আসবেন।

ওঁদের দেখেই সাদর সম্ভাষণ জানালেন ডক্টর হিরন্ময়—আসুন।

মিঃ জাফরী, ডাঃ রায় ও ফেরদৌসের মধ্যে একবার দৃষ্টি বিনিময় হলো, তাঁরা বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন যেন। ডক্টর হিরন্ময়কে অনুসরণ করলেন।

মস্তবড় হলঘর।

এতবড় ঘরখানায় মাত্র সামান্য আসবাবপত্র। কয়েকটা হাতলছাড়া লোহার চেয়ার। একটা টেবিল। টেবিলে কয়েকটা সংবাদপত্র ছড়িয়ে পড়ে আছে। একপাশে তিনটা আলমারী। আলমারী তিনখানা বইপুস্তকে ভর্তি। এ ছাড়া দেয়ালে দু'খানা বড় আকারের ছবি। একটা যীশুর, একটা ডক্টর হিরন্ময়ের নিজের।

হিরন্ময়ের ছবিখানা যেন জীবন্ত একটা প্রতিমূর্তি। ছবির চোখ দুটো যেন জ্বলজ্বল করছে।

কক্ষে প্রবেশ করে আরও অবাক হলেন তাঁরা। এত বড় এবং সুন্দর কক্ষটা কেমন যেন নিস্তব্ধ আর হিমশীতল।

ডক্টর হিরন্ময় একটু হেসে বললেন—একা মানুষ, বেশি আসবাব কি করবো, তাই সামান্য যা না হলেই নয়......কথা শেষ না করেই বলেন—বসুন।

সবাই আসন গ্রহণ করেন।

ডক্টর হিরন্ময়ও আসন গ্রহণ করে বললেন—আমি জানতাম তিন মহাত্মার আগমন ঘটবে, তাই আমি আপনাদের জন্য প্রতীক্ষা করছিলাম।

মিঃ জাফরীর সঙ্গে পুনরায় ডাঃ রায় এবং মিঃ ফেরদৌসের দৃষ্টি বিনিময় হলো। তিন পুলিশ গোয়েন্দার চোখেমুখেই বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠলো।

ডক্টর হিরন্ময় পূর্বের ন্যায় হাসিমুখেই বললেন—আমার কার্যকলাপ সন্দেহজনক বটে, কাজেই আপনাদের মনে সন্দেহ দানা বাঁধবে, এতে আর আশ্চর্যের কি আছে। এবার আপনারা আমাকে যা জিজ্ঞাসা করবেন করুন।

ডক্টর হিরন্ময়ের কথায় পুলিশ গোয়েন্দারা যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। কি প্রশ্ন করবেন যেন খুঁজেই পাচ্ছেন না।

মিঃ ফেরদৌস বললেন—আমরা ঠিক আপনাকে সন্দেহ করে এখানে আসিনি। আপনি নিজেই কিন্তু আমাদের প্রতি সন্দেহ পোষণ করছেন। আমরা অন্য কারণেও তো আসতে পারি।

আপনারা যে কারণেই আসুন আমি আপনাদের নিকটে কয়েকটা কথা বলবো।

মিঃ ফেরদৌস বললেন— বলুন।

ডাঃ রায় সিগারেট কেস বের করে সকলের সম্মুখে বাড়িয়ে ধরলেন।

সবাই একটা করে সিগারেট তুলে নিলেন ডাঃ রায়ের সিগারেট কেস থেকে এবং ধন্যবাদ জানালেন।

ডক্টর হিরন্ময় সিগারেট হাতে নিয়ে উলটে-পালটে ভালভাবে পরীক্ষা করে ঠোঁটের ফাঁকে গুজলেন।

মিঃ ফেরদৌস প্রত্যেকের সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে নিজের সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলেন। পুলিশ গোয়েন্দাত্রয় উন্মুখ হয়ে রয়েছেন কি বলতে চান ডক্টর হিরন্ময়।

ডক্টর হিরন্ময় একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—দেখুন, আপনারা দক্ষ গোয়েন্দা, আমি একজন সামান্য বৈজ্ঞানিক। থামলেন ডক্টর হিরন্ময়। তাঁর চোখ দুটো যেন জ্বলছে বলে মনে হলো। একটা রহস্যপূর্ণ হাসির রেখা ফুটে উঠলো তাঁর মুখে।

পুলিশ গোয়েন্দাত্রয় সিগারেটের ধোঁয়ার ফাঁকে তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে আছেন ডক্টর হিরন্ময়ের মুখের দিকে।

ডক্টর হিরন্ময় তাঁর অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা এ্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে রেখে সোজা হয়ে বসলেন।

একরাশ শুভ্র দাঁড়ি গোঁফের ফাঁকে অপরিস্কৃত লালচে দাঁতগুলো কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিলো। মাথাভরা একরাশ জটধরা চুল কিছুটা সাদা কালো মেশানো। কতদিন যে সে চুলে চিরুণী পড়েনি তা কেউ সঠিক করে বলতে পারবে না। শরীরে গলা থেকে পা পর্যন্ত ওভারকোট কিন্তু বহু দিনের পুরোন জীর্ণ, স্থানে স্থানে সেলাই খুলে ঝুলে পড়েছে। চোখে পাওয়ার ওয়ালা চশমা।

এই অদ্ভুত চেহারার লোকটাকে ঘিরে গোয়েন্দাত্রয়ের মনে নানা রকম প্রশ্ন উঁকিঝুকি মারছিলো। তাঁরা জানতে চান কি বলবেন ডক্টর হিরন্ময়।

এবার ডক্টর হিরন্ময় বলতে শুরু করলেন—জানি, আপনাদের মনে আমাকে নিয়ে প্রশ্নের অন্ত নেই। তা ছাড়া আপনারা অনেকদিন থেকেই গোপনে আমার কার্যকলাপ লক্ষ্য করে চলেছেন। এটা অবশ্য স্বাভাবিক।

থামলেন ভদ্রলোক।

মিঃ জাফরী এবং ডাঃ রায়ের মুখমন্ডল অত্যন্ত গম্ভীর মনে হচ্ছিলো। ডক্টর হিরন্ময়ের আচরণ এবং কথাবার্তা যেন এই গোয়েন্দাত্রয়ের একেবারে অন্তরের কথা। তাঁরা ভাবছেন লোকটা জ্যোতিষী নাকি। সব যেন আগে আগেই জেনে নিয়েছেন।

মিঃ ফেরদৌসের মুখ কিন্তু কোনো ভাবান্তরের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তিনি জিজ্ঞাসাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ডক্টর হিরন্ময়ের মুখের দিকে।

ডক্টর হিরন্ময় বলে চললেন—আজ কয়েকমাস হলো আমি কান্দাই শহরে এসেছি, তারপর থেকেই লক্ষ্য করছি শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে এক রহস্যময় হত্যাকান্ড লেগেই আছে। শহরের মানুষের মনে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে আছে সর্বক্ষণের জন্য। কারণ কখন কার ভাগ্যে মৃত্যু আসবে কেউ জানে না। পুলিশমহল এই হত্যারহস্য উদঘাটন নিয়ে নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু তার সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন না। হাঁ, আমি শুনেছি এ হত্যা নাকি একটা দস্যু দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে।

হাঁ, আমাদেরও এই রকম একটা ধারণা আছে। বললেন মিঃ জাফরী।

কিন্তু সেটা সত্য নাও হতে পারে। একটা গল্প আজ আমি আপনাদের বলবো, আপনারা যদি ধৈর্যসহকারে শুনতে রাজী হন তবে বলছি।

নিশ্চয়ই শুনবো বলুন, বললেন মিঃ ফেরদৌস। ডাঃ রায় এতোক্ষণ গম্ভীরভাবে ডাঃ হিরন্ময়কে লক্ষ্য করছিলেন এবং তাঁর কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনছিলেন। তিনি সায় দিয়ে বললেন—বলুন আপনার গল্প, আমরা শুনতে রাজী আছি।

ডক্টর হিরন্ময় এবার কোনো ভূমিকা না করেই শুরু করলেন—চল্লিশ বছর আগে আমি যখন যুবক ছিলাম তখন আমি কাংরু দ্বীপে যাই এবং সেই দ্বীপে বসবাস করতে থাকি। যৌবনকাল থেকেই আমার মধ্যে একটা গবেষণামূলক মনোভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো। অতি কষ্টেও আমি নিজের মনোভাবকে দমন করতে পারিনি। আমার বাবা একজন দক্ষ শিক্ষক ছিলেন। কাজেই তিনি আমাকে লেখাপড়া শিক্ষা দিতে কার্পণ্য করেননি। লেখাপড়া শিখে আমি একজন প্রফেসার বা বড় চাকুরে হবো এই ছিলো বাবার ইচ্ছা, কিন্তু আমি বাবার ইচ্ছা পূরণ করতে পারিনি। কাংরু দ্বীপে গিয়ে আমার ইচ্ছামত গবেষণায় মন দিলাম।

একটু থামলেন ডক্টর হিরন্ময়। পকেট থেকে একটা মরচে ধরা সিগারেট কেস বের করে তিনি নিজে একটা সিগারেট ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজলেন, ভদ্রোচিতভাবেও কাউকে তাঁর সিগারেট কেস থেকে সিগারেট নেবার জন্য অনুরোধ করলেন না। সিগারেট ঠোঁটে গুঁজে অগ্নিসংযোগ করে কয়েক টান দিয়ে পুনরায় আংগুলে চেপে ধরে বলতে শুরু করলেন—অল্পদিনেই একটা ল্যাবরেটরী করে চললো আমার গবেষণা। আমার কয়েকজন বন্ধুও জুটে গেলো। কাংরু দ্বীপটা ছোটখাটো ছিলো না। অনেক ভদ্র এবং সম্ভ্রান্ত লোকের বসবাস ছিলো এই দ্বীপে। দিন আমার বেশ কাটতে লাগলো, কাজও আমার চললো......থামলেন ডক্টর হিরন্ময়।

মিঃ জাফরী ক্রমেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলছেন, তিনি মুখখানা অত্যন্ত গম্ভীর করে নিয়েছেন।

ডাঃ রায় এবং ফেরদৌস মনোযোগ সহকারে শুনছিলেন।

ডক্টর হিরন্ময় বলে চলেছেন—হঠাৎ এক রাতে কাংরু দ্বীপে একটা লোক খুন হলো। সেদিন ছিলো পূর্ণিমা রাত। চারদিকে জ্যোৎস্না ঝলমল। কেমন করে যে এই হত্যাকান্ড ঘটলো কেউ বলতে পারলো না। হাঁ, প্রথম

একটা লোকের হত্যাকান্ড কাংরু দ্বীপের লোকের মনে তেমন কোনো ভয়ের সঞ্চার করলো না।

তারপর? প্রশ্ন করে বসলো মিঃ ফেরদৌস।

ডাঃ রায় একটু নড়ে বসলেন।

মিঃ জাফরী এতক্ষণে সজাগ হয়ে নতুন একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলেন।

ডক্টর হিরন্ময় বললেন—দ্বিতীয় পূর্নিমায় পুনরায় আর একটা লোক নিহত হলো। এবার কাংরু দ্বীপের লোকের মনে আতঙ্ক জাগলো। মুখ কালো হলো সবার। দিন যায় রাত আসে, আমার এলো পূর্ণিমা। সমস্ত কাংরু দ্বীপের অধিবাসীর মনে একটা দারুণ ভীতিভাব মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। পুলিশমহলে সাড়া পড়লো। কাংরুর পথে-ঘাটে পুলিশ কড়া পাহারা চালালো। আমি এবং অন্যান্য বন্ধুও বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। পুলিশমহল আমাকে সন্দেহ করে বসলো—কারণ আমি একজন বৈজ্ঞানিক, হয়তো বা আমিই এ হত্যালীলা চালিয়ে চলেছি। আবার থামলেন ডক্‌টর হিরন্ময় তাঁরপর একটু হেসে বললেন—যেমন ধরুন আপনাদের মনেও আমাকে নিয়ে সন্দেহের দানা বেঁধে উঠেছে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন মিঃ জাফরী—আপনাকে আমরা সন্দেহ করি একথা আপনাকে কে বলেছে...

ডক্‌টর হিরন্ময় এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে বলতে লাগলেন—পুলিশ আমার পিছু নিলো। তবু হত্যাকান্ডের শেষ হলো না। প্রতি পূর্ণিমা রাতে হত্যাকান্ড ঘটেই চললো। পুলিশমহল যখন আমাকে দোষী বা হত্যাকারী মনে করে আমার পিছনে লাগলো, তখন আমি নিজেও আমার গবেষণা ত্যাগ করে সেই হত্যারহস্য উদঘাটনের জন্য গোপনে প্রচেষ্টা চালালাম। আমাকে সহযোগিতা করে চললো আমার কয়েকজন বিশ্বস্ত বন্ধু। কিন্তু আমি জানতাম না আমারই বিশ্বস্ত এক বন্ধু এই হত্যাকান্ডের নায়ক...

মিঃ জাফরী বলে উঠলেন—আপনারই এক বন্ধু!

হাঁ। অদ্ভুত সে মানুষ। সর্বদা আমার—পাশে পাশে থাকতো, এই হত্যাকান্ড নিয়ে নানারকম আলাপ আলোচনা করতো, অথচ...তাই আমার মনে হয় হত্যাকারী বেশি দূরে নেই—মনে করুন আপনাদেরই একজন এই রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের নায়ক। কথাটা শেষ করে এবার ডক্টর হিরন্ময় তাঁর আংগুলের সিগারেটটা ঠোঁটের ফাঁকে গুজে তাতে অগ্নিসংযোগ করলেন।

ভ্রু কুঞ্চিত হলো মিঃ জাফরীর, তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালেন ডক্টর হিরন্ময়ের মুখে।

ডাক্তার রায় তাকালেন মিঃ ফেরদৌসের দিকে।

এরপর কি প্রশ্ন করবেন তাঁরা ভেবে পেলেন না।

কিছুক্ষণ সবাই নীরব, নিস্তব্ধ রইলেন। তারপর ডক্টর হিরন্ময়ই বললেন—আমাকে যা জিজ্ঞাসা করবেন তার জবাব আমি দেবো কিন্তু আমার গবেষণার ব্যাপারে আমি কোনো কথা বলতে রাজী নই।

মিঃ ফেরদৌস বললেন—আপনি তাহলে একজন দক্ষ গোয়েন্দা কি বলেন?

হাঁ, দক্ষ গোয়েন্দা বটে কিন্তু আমি আপনাদের কোনো কাজে আসবো না, কারণ আমার সময় অতি কম। আচ্ছা, আজ তাহলে আসুন।

উঠতে বাধ্য হলেন জাঁদরেল পুলিশ গোয়েন্দাত্রয়। ডক্টর হিরন্ময় তাঁর কথা শেষ করে কক্ষের অপরদিকের আলমারীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

বাইরে যখন তাঁরা বেরিয়ে এলেন তখন একটা শব্দ পেয়ে তাঁরা বুঝতে পারলেন এটা আলমারী খোলার শব্দ। ডক্টর হিরন্ময় আলমারীটা খুলেছেন।

মিঃ জাফরী, ডাঃ রায় এবং মিঃ ফেরদৌস ফিরে এলেন মিঃ জাফরীর অফিসরুমে। ডক্টর হিরন্ময় সম্বন্ধে তাঁরা যে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এলেন তা অত্যন্ত জটিল। ডক্টর হিরন্ময়ের কাছে তাঁরা কি গল্প শুনতে গিয়েছিলেন? গল্পের মাধ্যমে যা তিনি বললেন সে অতি সত্য কথা। হতেও পারে, খুনী তাঁদেরই একজন।

কিন্তু কে সে?

❑

শঙ্কর রাও তাঁর বাসভবনে বসে গভীরভাবে কি যেন লিখছিলেন। টেবিলে অনেকগুলো কাগজপত্র ছড়ানো। উজ্জ্বল আলো জ্বলছে।

এমন সময় তাঁর পেছনে এসে দাঁড়ালো এক ছায়ামূর্তি। সমস্ত শরীর তার আলখেল্লায় ঢাকা, মুখে মুখোস। মুখোসের মধ্য দিয়ে দুটো ছিদ্রপথে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে দুটো চোখ।

আলখেল্লার মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো একটা লোমশ হাত। হাতে একটা রিভলভার।

শঙ্কর রাওয়ের সম্বিৎ ফিরে এলো, তিনি চমকে চোখ তুলে তাকাতেই আঁতকে উঠলেন, অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—কে তুমি?

আলখেল্লার মধ্য হতে শোনা গেলো চাপা কণ্ঠ—আমি তোমার বন্ধু।

বন্ধু।

হাঁ।

তোমার হাতে রিভলভার কেন?

যদি চীৎকার করো তাই। শোনো শঙ্কর রাও, আমি কে জানতে চেয়ো না, তাহলে মৃত্যু।

তুমিই কি তাহলে ডাক্তার রায়ের ওখানে গিয়েছিলে?

হাঁ। কাল অমাবস্যা—আমার সাধনার জন্য একটা লোক আমার দরকার।

তা আমার কাছে কেন? ঢোক গিলে বললেন মিঃ শঙ্কর রাও।

আমার সাধনার শিকার হিসেবে আমি তোমাকেই মনোনীত করেছি।

আমাকে!

হাঁ, তোমাকে

আমি—আমি......

কোনো কথাই তোমার শুনবো না। খবরদার। চীৎকার করবে না, উঠে এসো।

না না, আমি যাবো না।

তাহলে এই মুহূর্তে তোমার মৃত্যু ঘটবে। জানো আমার এ রিভলভার থেকে গুলী বের হলে কোনো শব্দ শোনা যাবে না। কাজেই উঠে পড়ো।

আলখেল্লাধারী তার রিভলভারখানা শঙ্কর রাওয়ের পিঠে চেপে ধরলো।

যন্ত্রচালিত পুতুলের মত শঙ্কর রাও উঠে দাঁড়ালেন। চারদিকে তাকালেন, কেউ নেই, এমন কি তাঁর বাড়ির কুকুরটাও কোথায় যেন উবে গেছে।

অসহায় অবস্থায় এগুতে লাগলেন।

তাঁর কক্ষ থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ালেন। কেউ যদি এ সময়ে এসে পড়তো তাহলে হয়তো তাঁর জীবন রক্ষা পেতো। কিন্তু সমস্ত বাড়িখানা যেন ঘুমন্ত পুরীর মত ঘুমিয়ে পড়েছে।

আলখেল্লাধারীর চাপাকণ্ঠ—দাঁড়ালে কেন, চলো?

আবার চলতে শুরু করলেন শঙ্কর রাও। এখনও তাঁর পিঠে ঠান্ডা একটা স্পর্শ অনুভব করছেন তিনি।

গাড়ি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন ওরা।

শঙ্কর রাও দেখলেন, একটা নীল রঙের গাড়ি তাঁর গাড়ি বারান্দায় অপেক্ষা করছে।

আলখেল্লাধারী শঙ্কর রাওকে লক্ষ্য করে বললো—ড্রাইভ আসনের পাশে উঠে বসো।

শঙ্কর রাও তাই করলেন, না করে উপায় ছিলো না।

এবার আলখেল্লাধারী ড্রাইভ আসনে উঠে বসলো।

গাড়িখানা উল্কা বেগে ছুটে বেরিয়ে এলো গাড়ি-বারান্দা থেকে।

পরদিন শঙ্কর রাওয়ের উধাও হওয়ার ব্যাপারটা পুলিশমহলে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেন। সমস্ত শহরে কথাটা ছড়িয়ে পড়লো বিদ্যুৎগতিতে, এক মহা আতঙ্ক জাগলো কান্দাইয়ের মানুষের মনে।

কান্দাইর অলিতে গলিতে, এখানে-সেখানে সবার মুখে ঐ কথা-পুলিশ গোয়েন্দা শঙ্কর রাও নিখোঁজ হয়েছেন।

এত সাবধানতার মধ্যেও তিনি গেলেন কোথায়? সকলের মনে ঐ একই প্রশ্ন।

কাল অমাবস্যা।

পুলিশমহল ভীষণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সমস্ত শহরে পুলিশ ফোর্স ছুটাছুটি শুরু করে দিয়েছে।

পুলিশ অফিসে আলোচনা চলছে।

মিঃ জাফরী বললেন—আপনারা যাই বলুন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ রহস্যের মূল ডক্টর হিরন্ময়। তাঁর কথাবার্তা সব সন্দেহজনক। তাঁর কার্যকলাপও অত্যন্ত রহস্যময়...

মিঃ ইলিয়াস বললেন—তাঁর বাড়ি এবং ল্যাবরেটরীতে আচমকা হানা দিয়ে অনুসন্ধান চালানো উচিত।

মিঃ হারুন তাঁর কথায় সায় দিয়ে বললেন—স্যার, আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করা উচিত হবে না। নিশ্চয়ই ডক্টর হিরন্ময় শঙ্কর রাওকে উধাও করেছেন।

মিঃ হারুনের কথা শেষ হয় না, মিঃ ফেরদৌস সেই স্থানে উপস্থিত হন। তাঁর মুখমন্ডলে কোনো রকম উদ্বিগ্নতার ছাপ নেই। কক্ষে প্রবেশ করে তিনি বললেন—গুড্ মর্নিং।

মিঃ জাফরী বলে উঠলেন—আপনি কি এখনও শঙ্কর রাওয়ের নিখোঁজ সংবাদ শোনেননি?

মিঃ ফেরদৌস বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন—শঙ্কর রাও নিখোঁজ। বলেন কি স্যার।

হাঁ, এ সংবাদ সবাই জেনেছে অথচ আপনি......

আমি জানিনি, কারণ আমি বাসায় ছিলাম না।

আপনি বাসায় ছিলেন না?

না।

তবে আপনি সমস্ত রাত কোথায় ছিলেন?

রহস্যময় হত্যাকারীর সন্ধানে।

কোনো সন্ধান পেলেন? জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ জাফরী।

ঠিক ঐ মুহূর্তে সেখানে হাজির হলেন ডাঃ রায়। তিনি একটা শব্দ করলেন—মিঃ ফেরদৌস কেন, তাঁর মত সাতজন গোয়েন্দা সমস্ত বছর ধরে সন্ধান চালিয়েও এই হত্যারহস্যের সন্ধান পাবেন না জানি......

মিঃ ফেরদৌস ফিরে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন—কারণ?

ডাঃ রায় গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—কারণ হত্যাকারী অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তার সাধনা চালিয়ে চলেছে। যার এতটুকু সূত্র আমরা আজও আবিস্কারে সক্ষম হইনি।

হঠাৎ ফেরদৌস হেসে উঠলেন, তারপর হাসি থামিয়ে বললেন—খুনী যতই সতর্কতার সঙ্গে তার সাধনা চালিয়ে যাক না কেন, কাল তার সাধনার সমাপ্তি......

ডাঃ রায়ের চোখ দুটো বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে উঠলো।

মিঃ জাফরীও অবাক কণ্ঠে বলে উঠলেন—এ যে আপনি ভবিষ্যদ্বাণী করছেন মিঃ ফেরদৌস?

হাঁ, ভবিষ্যদ্বাণীই বটে। বললেন মিঃ ফেরদৌস।

মিঃ জাফরী বললেন—কালকের জন্য অপেক্ষা করা যায় না মিঃ ফেরদৌস। আজই আমি ডক্টর হিরন্ময়ের বাসভবনে তল্লাশি চালাতে চাই।

স্যার, কোনো ফল হবে না, বরং কালকের জন্য তৈরি থাকুন। ৫।৩ঘড়ির দিকে তাকালেন মিঃ ফেরদৌস, তারপর বললেন—এখন চলি গ্যার। একটু জরুরী কাজ আছে। গুড্ বাই...বেরিয়ে যান মিঃ ফেরদৌস।

মিঃ জাফরী বললেন—এই যুবক গোয়েন্দাটার আচরণ আশ্চর্যজনক। বড় খেয়ালী......

ডাঃ রায় বললেন—খেয়ালীর খেয়াল নয় এই হত্যা রহস্যের রহস্য উদঘাটন করা। আমার মনে হয়—শঙ্কর রাও এই হত্যারহস্য উদঘাটনের জন্যই সবাইকে কিছু না জানিয়ে কোথাও উধাও হয়েছেন।

মিঃ জাফরী বললেন—শঙ্কর রাও আমাকে কিছু না জানিয়ে কোথাও যাবেন না, এটাই আমার বিশ্বাস।

ডাঃ রায় বললেন—স্যার, এসব আলোচনা পরে করলেই চলবে। এখন চলুন আমরা ডক্টর হিরন্ময়ের বাসভবনে তল্লাশি চালানোর জন্য যাত্রা করি। বিলম্বে বিফলতা আসতে পারে।

হাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন ডাঃ রায়, আর আমাদের বিলম্ব করা ঠিক হবে না। কথা শেষ করে মিঃ জাফরী পুলিশ সুপারকে ফোন করার জন্য রিসিভার হাতে তুলে নিলেন।

❑ ·

বনহুর নূরীর মুখখানা তুল ধরে, নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে সে ওর মুখের দিকে।

নূরী বলে—কি দেখছো অমন করে?

আজ তোমাকে বড় সুন্দর লাগছে নূরী। জোছনার আলোর মতই সুন্দর, তাইতো দেখছি।

আজ কি তুমি আমায় নতুন দেখছো হুর?

তুমি আমার কাছে চিরনতুন। নূরী?

বলো?

আজ অমাবস্যা রাত।

হাঁ।

কান্দাই হত্যারহস্যের আজ হয় পরিসমাপ্তি, নয় আমার জীবনের সমাপ্তি।

হুর।

অমন শিউরে উঠলে কেন নূরী?

না না, তোমাকে আমি যেতে দেবো না।

আবার সেই কথা? অবুঝ মেয়ের মত......

নূরী বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে ওর বুকে মুখ গুঁজে বলে—এই অমাবস্যা রাত, আমার বড় ভয় করে। যদি তোমার কিছু হয়......

মৃত্যু যখন একদিন হবেই তাতে ভয় করে লাভ কি নূরী? যদি জীবন দিয়েও পারি কতগুলো জীবন রক্ষা করতে তবু ভাল। আমাকে খুশী মনে বিদায় দাও নূরী।

নূরীর গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

বনহুর আংগুল দিয়ে ওর চোখের গড়িয়ে পড়া পানি মুছে দিতে দিতে বলে—একটুতেই তোমরা চোখের পানি ফেলো, এটা আমার কাছে মোটেই ভাললাগে না। তুমি তো এমন ছিলে না নূরী?

ঐ মুহূর্তে জাভেদ এসে হাজির হলো, চোখেমুখে তার খুশীর উচ্ছ্বাস। পিতামাতাকে একত্রে দেখে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো— সাবাস.......

এই শব্দটা সে তার আব্বুর কাছে শিখেছিলো, তাই যখন সে খুশী হতো তখন ঐ শব্দটা উচ্চারণ করতো।

বনহুর জাভেদকে টেনে নিলো কাছে।

নূরী তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখের পানি মুছে ফেললো।

বনহুর বললো—জাভেদ, এতক্ষণ কোথায় ছিলো আব্বু?

বাঘ মারতে গিয়েছিলাম।

বাঘ?

হাঁ আব্বু। তুমিও চলো না আমার সঙ্গে, মস্তবড় বাঘ মারবো।

আচ্ছা যাবো, কিন্তু আজ একটা মানুষ বাঘকে মারতে হবে।

মানুষ বাঘ। অবাক হয়ে প্রশ্ন করে জাভেদ।

বনহুর বলে—হ্যাঁ, মানুষ বাঘ।

মানুষ বাঘ কেমন আব্বু।

আমার মত।

তোমার মত সুন্দর?

হাসে বনহুর।

জাভেদ পুনরায় বলে—মানুষ বাঘ কি খায়?

মানুষ খায়।

মানুষ বাঘ মানুষ খায়?

হাঁ।

সর্বনাশ......

আমি তাকেই মারতে যাবো।

আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

না, আগে বড় হও।

তোমার মত এ—তো বড় হবো?

হাঁ।

এমন সময় রহমান এসে কুর্ণিশ জানিয়ে দাঁড়ায়—সর্দার! সময় হয়ে গেছে।

হাঁ, চলো।

জাভেদকে আদর করে ফিরে তাকায় নূরীর দিকে। তারপর টেবিল থেকে রিভলভারটা নিয়ে প্যান্টের পকেটে রাখে।

নূরী জাভেদের হাত ধরে সরে দাঁড়ায়, দু'চোখে তার অশ্রু ছল-ছল করছে।

বনহুর বেরিয়ে আসে আস্তানা থেকে।

আস্তানার বাইরে অপেক্ষা করছে তাজ আর দুলকী।

রহমান আর বনহুর এসে দাঁড়ালো নিজ নিজ অশ্বের পাশে।

দু'জন অনুচর তাজ আর দুলকীর লাগাম ধরে ছিলো।

বনহুর আর রহমান নিজ নিজ অশ্বের লাগাম চেপে ধরতেই অনুচর দু'জন সরে দাঁড়ালো।

নূরী জাভেদের হাত ধরে দাঁড়িয়ে রইলো।

বনহুর তাজের পিঠে চেপে বসতেই রহমান চেপে বসলো তার দুলকীর পিঠে।

পশ্চিম আকাশে তখন অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি ম্লান হয়ে এসেছে।

যতক্ষণ দেখা গেলো ততক্ষণ নূরী আর জাভেদ দাঁড়িয়ে রইলো স্থির হয়ে।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠলো।

ফিরে এলো নূরী জাভেদকে নিয়ে।

বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করে ডাকলো নূরী—বাপমনি।

আম্মি।

বড় হলে তুমিও আমাকে এমন করে ছেড়ে যাবে?

হাঁ, আম্মি।

বড় দুষ্ট হবে তুমি।

আব্বু বুঝি দুষ্ট?

তোমার আব্বু বড় দুষ্ট। দেখোনা সব সময় কেমন বাইরে বাইরে কাটায়?

আমিও যাবো। আব্বুর মত আমিও ঘোড়ায় চড়বো.......

মা আর পুত্রে যখন কথা হচ্ছে তখন বনহুর আর রহমান কান্দাই জঙ্গল পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে। তাদের ঘোড়ার খুঁড়ের আওয়াজ নিস্তব্ধ বনভূমি প্রকম্পিত করে তুলেছে।

কান্দাই জঙ্গল পার হয়ে প্রশস্ত পথ।

পথের উপরে একটা গাড়ি অপেক্ষা করছিলো, গাড়ির ড্রাইভ আসনে বসে আছে ড্রাইভার।

ড্রাইভার অন্য কেউ নয়, বনহুরের শহরের আস্তানার একজন বিশ্বস্ত অনুচর।

বনহুর আর রহমান গাড়িখানার পাশে এসে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে তাজ আর দুলকী সরে দাঁড়ালো।

ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির পেছনের দরজা খুলে ধরলো।

গাড়িতে উঠে বসলো বনহুর আর রহমান।

❑

অমাবস্যার রাত।

চারদিকে থমথমে অন্ধকার।

মিঃ জাফরী তাঁর দলবল নিয়ে প্রতীক্ষা করছেন। প্রত্যেকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। বারবার মিঃ জাফরী হাতঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছেন। একটা ফোন পাওয়ার অপেক্ষা করছেন তাঁরা।

কক্ষটার বাইরে জমাট অন্ধকারে একটা মোটর গাড়ি অপেক্ষা করছে। গাড়ির ড্রাইভ আসনে ড্রাইভার প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। যে কোনো মুহূর্তে গাড়ি নিয়ে তাকে ছুটতে হবে।

আচমকা ফোন বেজে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে কক্ষে যারা এতক্ষণ ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন তাঁরা সজাগ হয়ে দাঁড়ালেন।

মিঃ জাফরী রিসিভার হাতে তুলে নিলেন—হ্যালো, জাফরী স্পিকিং......

ওপাশের কথাগুলো অপর কেউ বুঝতে পারলেন না।

মিঃ জাফরী রিসিভার রেখে ব্যস্তকণ্ঠে বললেন—চলুন এবার।

মিঃ জাফরীর নির্দেশে তাঁর দলের সবাই কক্ষ ত্যাগ করে গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালেন। মিঃ জাফরী নিজে গাড়িতে চেপে বসে অন্য সবাইকে উঠে বসার ইঙ্গিত করলেন।

নির্দেশ পালন করলেন তাঁর সঙ্গীরা।

সবাই গাড়িতে চেপে বসার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি বিদ্যুৎবেগে চলতে শুরু করলো। গোটা কান্দাই শহর কুয়াশাচ্ছন্ন, জমাটা অন্ধকারে ছেয়ে আছে। আলোবিহীন গাড়িখানা এই অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে যাচ্ছে।

এদিকে মিঃ জাফরীর দল যখন তাঁদের গাড়ি নিয়ে ছুটে চলেছেন তখন কান্দাই শহরের জনবিহীন এক স্থানে একটা পোড়োবাড়ির নিভৃত একটা কক্ষে পায়চারী করে চলেছে সেই লোমশদেহী ব্যক্তিটি। সম্মুখের টেবিলে কতগুলো ছোটবড় সিরিঞ্জ এবং ওষুধ ভর্তি শিশি। একপাশে একটা বড় ফ্লাক্স বক্স, তার গায়ে সাংকেতিক কয়েকটা শব্দ লেখা রয়েছে। একপাশে কতগুলো অপারেশন অস্ত্র।

কক্ষে গাঢ় লাল আলো জ্বলছে।

লোমশদেহী কারও অপেক্ষা করছে বলে মনে হলো কারণ, সে বারবার দেয়ারঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। রাত দুটো বাজতে আর মাত্র আধঘন্টা বাকী।

বাড়িখানা কান্দাই শহরের এক প্রান্তে। তাছাড়া পোড়োবাড়ি কাজেই নিস্তব্ধ নির্জন। বাড়ির বাইরে থেকে বাড়িখানাকে সম্পূর্ণ ভাঙ্গাচুরা জঙ্গলাকীর্ণ মনে হলেও তার ভিতরে কয়েকটা কক্ষ পরিচ্ছন্ন এবং বাসোপযোগী।

যে কক্ষে লোমশদেহী পায়চারী করছিলো, সেই কক্ষের পাশের কক্ষটা বসবার জন্য রাখা হয়েছে, কারণ কয়েকখানা চেয়ার ঐ কক্ষটার মধ্যে সাজানো রয়েছে।

কক্ষটার দরজায় মোটা জমকালো পর্দা ঝুলছে।

পর্দা ঠেলে কক্ষে প্রবেশ করলেন মিঃ ফেরদৌস। সমস্ত শরীর তাঁর ওভারকোটে ঢাকা। ওভারকোটের কলারটা কান অবধি উঠে গেছে। মাথায় ক্যাপ, হাতে গ্লাবস্।

বাইরের হিমশীতল বাতাসে তাঁর শরীরটা যেন জমে বরফ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।

কক্ষে প্রবেশ করে তাকালেন চারদিকে। তাঁর চোখেমুখে একটা বিস্ময়ভরা ভাব যদিও তাঁর চোখে চশমা ছিলো তবু তাঁর মুখ দেখে তা বোঝা যায়।

মাথার ক্যাপটা খুলে হাতে নিলেন মিঃ ফেরদৌস।

এমন সময় পাশের কক্ষ থেকে শোনা গেলো একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর—মিঃ ফেরদৌস, এখানে আসো।

মিঃ ফেরদৌস একবার তাকিয়ে দেখে নিলেন কক্ষের মাঝের দরজাটা। সেখানেও কালো পর্দা ঝুলছে।

মিঃ ফেরদৌস এবার পা বাড়ালেন পর্দার দিকে। নিজের অজান্তেই পা দু'খানা তাঁর কেঁপে উঠলো। তবু তিনি এগিয়ে চললেন।

পর্দা সরিয়ে কক্ষে প্রবেশ করেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন মিঃ ফেরদৌস, চোখেমুখে ভীতিভাব ছড়িয়ে পড়লো। কোনো কথা তাঁর কণ্ঠ দিয়ে বের হলো না। পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

লোমশদেহী তার লম্বা বাহু দু'টি প্রসারিত করে বললো—এসেছো বন্ধু? জানতাম তুমি আসবে। তাই আজ আমি আমার সাধনাগার ত্যাগ করে বাইরে যাইনি। এসো......এগিয়ে আসে লোমশদেহী।

মিঃ ফেরদৌস ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি যেন সম্মুখে যমদূত দেখতে পেয়েছেন।

এগিয়ে আসছে লোমশদেহী।

মিঃ ফেরদৌস বলেন—তুমি...তুমিই হত্যাকারী।

হাঁ, আমিই সেই অমাবস্যা রাতের রহস্যময় হত্যাযজ্ঞের সাধক। আমাকে চিনতে কষ্ট হচ্ছে? আর একটু পরেই আমি তোমার চোখ দুটো উপড়ে নেবো আর তোমার বুক থেকে তাজা রক্ত শুষে নেবো, তখন তুমি চিরনিদ্রায় ঢলে পড়বে। ঐ যে ফ্লাস্ক বক্স দেখছো ওটা আই ব্যাংক। ওর মধ্যে আছে তোমার ঐ চোখের মত শত শত চোখ।

মিঃ ফেরদৌস অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠেন—ওটা আই ব্যাংক? ওর মধ্যে আছে শত শত চোখ।

হাঁ।

অত চোখ তুমি কি করবে?

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো লোমশদেহী। হাসি থামিয়ে বললো—আমি তোমার বন্ধু, তাই আমার ডাকে তুমি এই হিমঝরা কুয়াশা রাতে এই নির্জন পোড়োবাড়িতে এসেছো। আজ আমাকে পথে বেরিয়ে শিকার খুঁজতে হলো না। এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ বন্ধু। হাঁ, যা জানতে চেয়েছো বলবো। অজানা বাসনা নিয়ে তুমি মরবে তা আমি চাই না। তুমি প্রশ্ন করেছিলে অত চোখ দিয়ে আমি কি করবো? শোনো, আমাদের অনেক লোক আছে যারা বিভিন্ন দেশে কাজ করে চলেছে। কোনো কোনো দল রক্ত শোষণ করে বিদেশে পাঠাচ্ছে।

রক্ত শোষণ করে বিদেশে পাঠাচ্ছে।

হাঁ, বিভিন্ন দেশে আমাদের ঘাঁটি আছে। তবে সবাই রক্ত শোষণ করে নেয়, মানে তারা শুধু ব্লাড ব্যাংক ভর্তি করে চালান দেয়।

আর তুমি......

আমি দুই-ই করে থাকি, কারণ আমি রক্ত এবং চক্ষু দুটোরই গবেষণা করি—আমার সাধনা অন্ধের দৃষ্টিদান......

অন্ধের দৃষ্টিদান। মৃত ব্যক্তির চোখ নিয়ে তুমি অন্ধের চোখে বসাতে চাও?

মৃত নয়, জীবন্ত ব্যক্তির চোখ আমি তুলে নেই, তারপর তার বুক থেকে রক্ত শোষণ করে নেই। এই দেখো চোখ তুলে নেবার যন্ত্র, আর এটা বুক থেকে রক্ত শোষণ করে নেওয়ার যন্ত্র।

উঃ কি সাংঘাতিক তুমি।

মোটেই নয়, কারণ যারা সাধক তারা যতটুকু ক্ষতি করে তার বহুগুণ উপকার করে। তোমার চোখ তুলে নিয়ে আমাদের দেশের কোনো কৃতী অন্ধ ব্যক্তির চোখে বসিয়ে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনা হবে। এমনি করে তোমাদের অকেজো মানুষের চোখ আর রক্ত আমাদের দেশের বহু গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের জীবনীশক্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে।

তুমি তো শুধু অমাবস্যা রাতেই তোমার হত্যাকান্ড চালিয়ে যাও, কিন্তু এত চোখ তুমি কোথায় পাও?

আবার হাসলো লোমশদেহী, বললো—অমাবস্যা রাতে আমি যার রক্ত এবং চক্ষু আমার সাধনার কাজে সংগ্রহ করি তাকে শহরের পথে বিসর্জন দেই। কিন্তু তুমি জানো না প্রতিদিন আমার সাধনা চলে। অতি গোপনে, অতি সাবধানে প্রতিরাতে আমাকে দু'টি চোখ আর কয়েক পাউন্ড রক্ত সংগ্রহ করতে হয়।

এত চোখ আর এত রক্ত দিয়ে কি করো তুমি?

তিন মাস পর পর আমি আই ব্যাংক আর ব্লাড ব্যাংক ভর্তি করে আমাদের দেশে চালান পাঠাই......

এসব চোখ নষ্ট হয়ে যায় না?

না। যেমন ব্লাড ব্যাংকে রক্ত নষ্ট হয় না, তেমনি আই ব্যাংকে চোখ নষ্ট হয় না! ব্লাড ব্যাংক আর আই ব্যাংকের বাক্স আছে। সেই বাক্সে ছ'মাস রক্ত এবং চোখ সজীব থাকবে।

কিন্তু এত লোক রোজ কোথায় পাও?

যেমন করে আজ আমি তোমাকে পেলাম...আর নয়, এবার তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও বন্ধু।

আমাকে হত্যা করবে তুমি?

হাঃ হাঃ হাঃ, তোমাকে আজ আমার কত প্রয়োজন তুমি বুঝবে না। তুমি মরবে কিন্তু তোমার ঐ দুটো চোখ আর একটা অন্ধের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেবে। তুমি শেষ হয়ে যাবে কিন্তু তোমার রক্ত আর এক জোয়ানের শরীরে প্রবাহিত হবে...হাঃ হাঃ হাঃ...দু'হাতে দুটি অদ্ভুত অস্ত্র নিয়ে লোমশদেহী এগুতে থাকে।

মিঃ ফেরদৌসের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে, পিছু হটতে থাকেন তিনি।

মৃত্যু তাঁর নিশ্চিত।

বাইরে সূচীভেদ্য অন্ধকার।

কুয়াশাচ্ছন্ন রাত। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম।

মৃত্যুর যবনিকা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে মিঃ ফেরদৌসের জীবনে।

আর কয়েক মিনিট। তাহলেই মিঃ ফেরদৌসের প্রাণহীন দেহটা পড়ে থাকবে কান্দাইয়ের কোনো এক রাজপথে।

মিঃ ফেরদৌস ঘেমে নেয়ে উঠেছেন, রীতিমত হাঁপাচ্ছেন তিনি।

লোমশদেহী একেবারে সম্মুখে এসে পড়লো বলে, তারপরই মৃত্যু। হঠাৎ মিঃ ফেরদৌস পকেট থেকে একটা বাঁশী বের করে তাতে ফুঁ দিলেন।

মুহূর্ত মাত্র।

সঙ্গে সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করলেন মিঃ জাফরী ও তাঁর দলবল। প্রত্যেকের হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র। ঘিরে ফেললেন তাঁরা লোমশদেহীকে।

লোমশদেহী ভাবতেও পারেনি এমন হতে পারে। কক্ষের মাঝখানে থাকলেও তাকে ধরা কারও পক্ষেই সম্ভব ছিলো না, কিন্তু লোমশদেহী তার কৌশলের স্থান পার হয়ে এসেছে, যেখানে এখন সে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে তার পালানো কিছুতেই সম্ভব নয়।

চারপাশ থেকে ঘিরে ধরলেন লোমশদেহীকে।

লোমশদেহী তার হাতের যন্ত্র দু'টি শরীরের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে ফেললো এবং সঙ্গে সঙ্গে দরজার দিকে লাফ দিলো।

মিঃ ফেরদৌস দরজা আগলে দাঁড়ালেন।

মিঃ জাফরী গুলী ছুড়েছিলেন লোমশদেহীর পিঠ লক্ষ্য করে। কিন্তু আশ্চর্য, গুলী লোমশদেহীর কোনো ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হলো না।

মিঃ ফেরদৌস বললেন—ওর হাত দু'খানা শৃঙ্খলাবদ্ধ করুন।

মিঃ হারুন এবং মিঃ ইলিয়াস দ্রুতহস্তে লোমশদেহী হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন।

মিঃ জাফরী বললেন—এবার লোমশদেহীকে আমরা জানতে চাই।

মিঃ ফেরদৌস বললেন—মিঃ জাফরী, ডক্টর হিরন্ময়ের কথাই সত্য, কারণ এই রহস্যময় হত্যাযজ্ঞের নায়ক আমাদেরই একজন বিশিষ্ট বন্ধু। এই দেখুন—আসলে লোমশ দেহ ওর আসল দেহ নয়। পেছনে বোতাম আছে......

মিঃ ফেরদৌস লোমশদেহীর পিছনের বোতাম খুলে ফেললেন, অমনি একটা লোমশ আলখেল্লা খুলে পড়লো মেঝেতে।

মিঃ ফেরদৌস ছাড়া সবাই বিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন—আপনি!

মিঃ ফেরদৌস হেসে বললেন—আমি পূর্বেই বলেছি হত্যাকারী আমাদেরই একজন......